ঈদ সংখ্যা

জুন ২০১৯ ❑ জ্যৈষ্ঠ - আষাঢ় ১৪২৬

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

ঈদ মোবারক

দিল আফরোজ জাহান দিয়া, ষষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মো. রাফিউল ইসলাম, চতুর্থ শ্রেণি, আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-43, No- 12, June 2019, Tk-20.00

আমিরা তাবাসসুম, দশম শ্রেণি, সফিউদ্দিন সরকার একাডেমি কলেজগেট, টঙ্গি, গাজীপুর

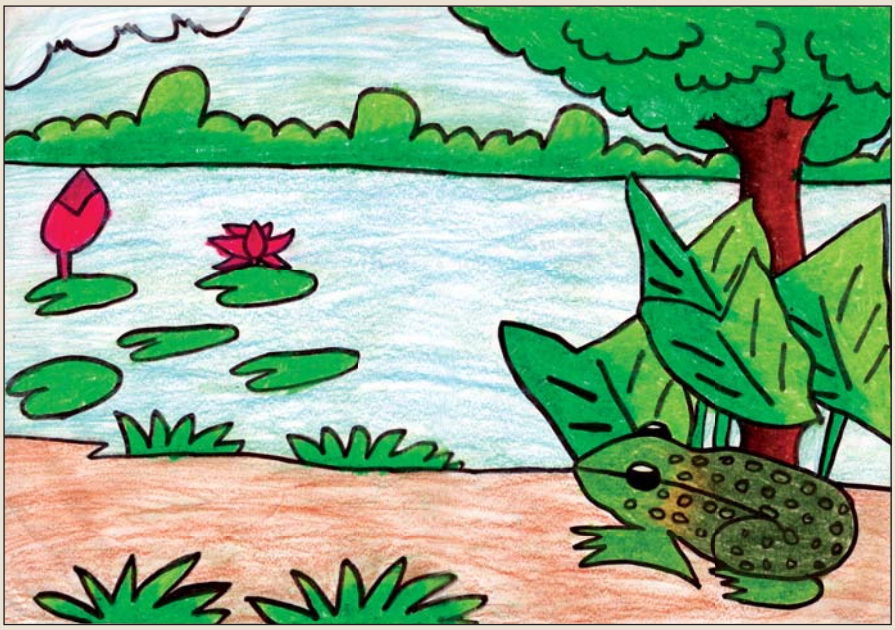

রাইসা সাজনীন খান, চতুর্থ শ্রেণি, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা

সম্পাদকীয়

ঈদুলফিতরের আনন্দ মাতিয়ে রাখুক সবাইকে। নবারুণের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মোবারক। আনন্দ করো সবাই মিলে, সবাইকে নিয়ে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ, হাজার বছর ধরে সব ধর্মের সব মানুষ একসাথে মিলে মিশে আছে। ঈদের আনন্দে আবারো সেই সম্প্রীতির উদাহারণ স্পষ্ট হয়ে উঠুক, এই কামনা করি।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনে নবারুণের এ সংখ্যা একটু অন্য রকম করে সেজেছে। বন্ধুরা, আমাদের চারপাশের সবকিছুকে নিয়েই তো আমাদের পরিবেশ। আমাদের চারপাশের সবাই ভালো থাকলে ভালো থাকে পরিবেশ। সেখানে কেবল মানুষ আছে, তা নয়। গাছপালা-পশুপাখি-কীটপতঙ্গ-পাহাড় পর্বত-খালবিল সবাইকে ভালো রাখতে হবে।

নবারুণ জানে, তোমরা গাছ ভালোবাসো। পশুপাখিদেরও ভালোবাসো। অনেক বন্ধু জানিয়েছ, পোষা প্রাণীদের প্রতি তাদের গভীর মমতার কথা। নবারুণের খুব ভালো লেগেছে এই অন্য রকমের সম্প্রীতির খোঁজ পেয়ে। অবলা পশুপাখি-গাছপালা মানুষের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। ওদেরকে ভালো রাখার জন্য মানুষের সচেতনতাই যথেষ্ট। আশা করি, নবারুণের বন্ধুরা এ ব্যাপারে অনেক সচেতন। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বলে সবার কষ্ট হচ্ছে, পশুপাখিদেরও হচ্ছে কিন্তু বলতে পারছে না। মানুষের মমতা দিয়ে আমরা সেইসব না বলা কথা শুনতে চাইব। নিশ্চয়ই চাইব।

সূচি

নিবন্ধ

০৪ ঈদের প্রথম কবিতা/ অনুপম হায়াৎ
০৮ ছোটোদের ঈদ আনন্দ/ রুমান হাফিজ
১১ ডিওক্যালিয়নের শেষরক্ষা/ খন্দকার মাহমুদুল হাসান
১৮ ভালো মানুষ হও/ সাদিয়া ইফফাত আঁখি
৩৩ বদলে যাওয়া একাল/ তাজিয়া কবীর
৪০ বিশ্ব পরিবেশ দিবস/ শাহানা আফরোজ
৪২ পশুপাখির বিচিত্র খবর/ হাফিজুর রহমান
৪৫ ওর নাম মিনার্ভা/ নাজিবা সায়েম
৫৮ আমার চঞ্চু, নিমি আর লাভ বার্ডের কথা
তাসনুভা নূহু (হিয়া)
৫৯ অবসরে কবুতর পালন/ মোহাম্মদ অংকন
৬৮ বাবা আমার বাবা/ মেজবাউল হক
৭৬ গরমে পানিশূন্যতা থেকে বাঁচার উপায়/ মো. জামাল উদ্দিন
৭৭ বিশ্ব রক্তদাতা দিবস/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৭৮ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পথশিশুরা/ জান্নাতে রোজী
৭৯ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

বিজ্ঞান

৪৬ মঙ্গল আলোকে নভোচারীদের কাহিনি/ নাদিরা মজুমদার
৭০ ব্ল্যাকহোলের প্রথম ছবি/ মিজান চৌধুরী
৭২ ইন্টারস্টেলার এবং ব্ল্যাক হোল/ সায়েরে নাজাবী সায়েম

গল্প

১৭ লাঠি যার মোষ তার/ সালেহীন আহমেদ সাহিব
১৯ অচেনা জুতো জোড়া/ আহমেদ রিয়াজ
২২ গন্ধ শুঁকে টাকার তোড়া/ অরুণ কুমার বিশ্বাস
৩৪ সাধু নরসুন্দর/ হেনা সুলতানা
৫৫ গাছ বিজ্ঞানী/ জান্নাতুল ফেরদৌস আইভি
৬০ বিলাইকে বলে ঘোলা/ মোজাম্মেল হক নিয়োগী
৬৪ পাখি মানুষ/ কাজী কেয়া
৭৪ বিম্ব/ কৃণন মাহমুদ নিয়োগী

প্রধান সম্পাদক: মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন **সম্পাদক:** নাসরীন জাহান লিপি
সহ-সম্পাদক: শাহানা আফরোজ, মো. জামাল উদ্দিন, তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
সম্পাদকীয় সহযোগী: মেজবাউল হক, সাদিয়া ইফফাত আঁখি
সহযোগী শিল্পনির্দেশক: সুবর্ণা শীল **অলংকরণ:** নাহ্‌রীন সুলতানা

এবারের নবারুণ প্রচ্ছদ সেজেছে নকশি কাঁথায়। আর এই অসাধারণ সুচিশিল্পটি করেছেন মাহমুদা বেগম খুকু।

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫, **E-mail :** editornobarun@dfp.gov.bd, **ওয়েবসাইট:** www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ: সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০, **মূল্য:** ২০.০০ টাকা। **মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

ভ্রমণ

১৪ আজগুবি এক বাঘের গল্প/ মোহাম্মদ শাহ আলম

কবিতা

০৩ মহাকবি কায়কোবাদ
০৬ জান্নাতা নিঝুম শিল্পী/ নাহার আহমেদ
দেলওয়ার বিন রশিদ
০৭ ফারুক হাসান/ মো. হাসিবুল হাসান
পাপিয়া সুলতানা পান্না
৩৮ মাহমুদ বিক্রম
৩৯ ফারুক নওয়াজ/ আব্দুস সালাম
৪১ আমীরুল ইসলাম
৫৭ মোহ্‌সেন আরা/ মাসুমা রুমা
৬৩ নিহাল খান/ আঞ্জুমন আরা
৬৭ ইমরান পরশ
৬৮ মো. জাওয়াদ হোসেন

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: দিল আফরোজ জাহান দিয়া, মো. রাফিউল ইসলাম
শেষ প্রচ্ছদ: আমিরা তাবাসসুম/ রাইসা সাজনীন খান
০৩ মীর্জা মাহের আসেফ
০৪ তাসফিয়া জামান তাসনিম
০৭ সুজানা চৌধুরী স্নেহা
২১ দ্বীপাঞ্জলি বড়ুয়া তন্নি
৩৩ অর্ক দাস
৩৮ ফাইরুজ ওয়াসিমা ইসানা
৩৯ জুনায়েদ তৌহিদ
৪১ মিনহাজুল আবেদীন সিয়াম/ তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ
৪৪ কাজী নাফিসা তাবাসসুম/ ওয়ার্দা বিনতে আমীর
আনিকা তাসনিম/ আয়ান হক ভূঁঞা
৫৪ সরকার লাবিব আল ইমরান
৫৫ রাইসা নুজহাত জামান
৬৩ জুনায়েদ তৌহিদ
৬৯ শ্রাবন সরকার/ মায়মুনা বিনতে মাহবুব
৭৩ আদনান আল আসাদ
৭৫ তাসনীম বিনতে সিদ্দিক

নবারুণ বন্ধুদের খোঁজখবর

নবারুণ বন্ধুদেরকে জানাই রমজানুল মোবারক। সামনেই আসছে ঈদুলফিতর। ঈদ মানেই আনন্দ, ঈদ মানেই খুশি। ঈদের আনন্দ শিশু -কিশোরদের ছুঁয়ে যায় সবচেয়ে বেশি। আমাদের নবারুণ বন্ধুরাও ঈদের দিনটি অনেক আনন্দের সাথে নিশ্চয়ই উদযাপন করবে।

ফেসবুক মতামত

খায়রুল আলম রাজু : সুন্দর আয়োজন নবারুণ। সবার সাথে ছাপা হলো আমার নিবন্ধ 'শিশু সাহিত্যে রবি ঠাকুর'। আহ! কী আনন্দ! প্রিয় 'নবারুণ' ম্যাগাজিনের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

নবারুণ : আপনাকেও ধন্যবাদ। সুন্দর ও শিশু-কিশোর উপযোগী লেখাকে 'নবারুণ' সবসময় স্বাগত জানায়।

আহমেদ কিবরিয়া : মে সংখ্যাটি খুব মজার তো! জাদু সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই।

নবারুণ : আপনি নবারুণ মে সংখ্যাটি পড়লে আশা করি জাদু সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারবেন।

তামিম হাসান : আচ্ছা নবারুণ কী খুলনায় পাওয়া যাবে?

নবারুণ : হ্যাঁ অবশ্যই। তবে অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে ম্যানেজার এবং বিক্রয় কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুণ এই নাম্বারে ০১৫৫২৩৭৫৬৮৮।

নবারুণ website : editornobarun@dft.gov.bd

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nabarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ-এর আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

মীর্জা মাহের আসেফ
তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল

আবার পড়ি

ঈদ আবাহন

মহাকবি কায়কোবাদ

এই ঈদ বিধাতার কিসে শুভ উদ্দেশ্য মহান,
হয় সিদ্ধ, বুঝে না তা স্বার্থপর মানব সন্তান।
এ নহে শুধু ভবে আনন্দ উৎসব ধুলো খেলা,
এ শুধু জাতীয় পূণ্য মিলনের এক মহা মেলা।
ভুলে যাও হিংসা- দ্বেষ,দলাদলি শত্রুতা ভীষণ,
মুসলিম জগতে আজি বিশ্বব্যাপী মহাসম্মেলন।
আজি এই ঈদের দিনে হয়ে সবে এক মনঃপ্রাণ,
জাগায়ে মুসলিম সবে গাহ আজি মিলনের গান।
ডুবিয়ে না ভরে আর ঈদের এ জ্যোতিষ্মান রবি,
জীবন সার্থক হবে, ধন্য হইবে এ দরিদ্র কবি।

মহাকবি কায়কোবাদের পুরো নাম ছিল কাজেম আল কোরায়শী। মুন্সী কায়কোবাদ নামেও ডাকা হতো তাঁকে। ১৮৫৭ সালের ২১শে জুলাই তারিখে (বর্তমানে বাংলাদেশের) ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ থানার অধীনে আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। এই বছরেই ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল। সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে লেখাপড়া করে তিনি ঢাকা মাদ্রাসাতে (বর্তমান কবি নজরুল সরকারি কলেজ) ভর্তি হন। কর্মজীবনে ছিলেন পোস্টমাস্টার। ১৯৫১ সালের ২১শে জুলাই মৃত্যুবরণ করেন এই মহাকবি।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসবিদদের মতে, মহাকবি কায়কোবাদই হচ্ছেন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক মুসলিম কবি। তাঁর রচিত মহাকাব্য 'মহাশ্মশান' অবাক করে দিয়েছিল সব শ্রেণির পাঠককে। তিনি বাঙালি মুসলিম কবিদের মধ্যে প্রথম সনেট রচয়িতা। সনেট হচ্ছে চতুর্দশপদী কবিতা। এই কবিতায় পদ বা চরণের সংখ্যা হচ্ছে চতুর্দশ বা চৌদ্দটি। প্রতিটি চরণে অক্ষরও থাকতে হবে চৌদ্দটি। মধ্যযুগের ইতালিতে এই রকম কবিতা লেখা শুরু হয়। তোমরাও চেষ্টা করে দেখতে পারো। ঈদের ছুটিতে লিখে ফেল সনেট, পাঠিয়ে দাও নবারুণ কে ঈদের উপহার হিসেবে।

নিবন্ধ

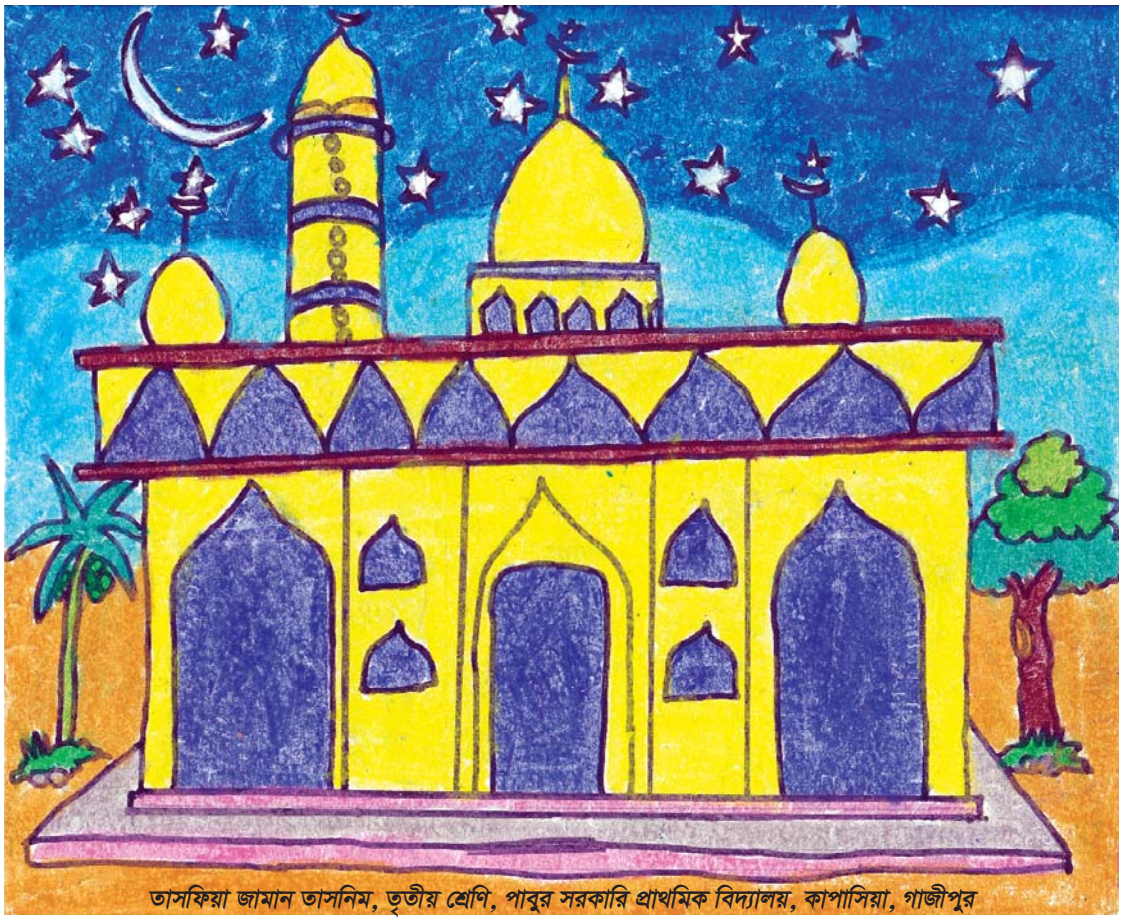

তাসফিয়া জামান তাসনিম, তৃতীয় শ্রেণি, পাবুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাপাসিয়া, গাজীপুর

ঈদের প্রথম কবিতা

অনুপম হায়াৎ

বাঙালি মুসলিম রচিত ঈদ নিয়ে প্রথম কবিতা কোনটি? কে ছিলেন এর লেখক? কোন সালে লেখা হয় কবিতাটি? এসব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় কবি সৈয়দ এমদাদ আলীর নিজের লেখায়। সৈয়দ এমদাদ আলী দাবি করেছেন, ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম বর্ষ 'নবনূর' পত্রিকা ঈদ সংখ্যায় 'ঈদ' নামে যে কবিতা প্রকাশিত হয় সেটিই মুসলিম বাংলার প্রথম কবিতা। সৈয়দ এমদাদ আলীই কবিতাটির লেখক। পরের বছর ১৯০৪ সালে তিনি ঈদ সম্পর্কে আরো একটি কবিতা লিখেন।

সাহিত্যিক আবুল ফজল লিখেছেন, 'কবি সৈয়দ এমদাদ আলীর উক্তি যদি সত্য হয়, তাহলে কবিতাটির ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। ঈদ সম্পর্কে পরে বহু কবি বহু উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন। একদিন এসবেরও একটি স্বতন্ত্র সংকলন হতে পারে। আর হতে পারে তুলনামূলক আলোচনা। সৈয়দ এমদাদ আলী সেদিন নিশ্চয়ই পথিকৃতের সম্মান পাবেন।'

মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুটি: ঈদুলফিতর ও ঈদুলআজহা। চন্দ্রমাস রমজানব্যাপী সিয়াম বা রোজা রাখার পর শাওয়ালের পহেলা তারিখে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে আনন্দোৎসব পালিত হয় ঈদুলফিতরের দিন। আর জিলহজ মাসের ১০ তারিখে আল্লাহর নামে পশু কুরবানির মাধ্যমে আনন্দোৎসব পালিত হয় ঈদুলআজহার দিনে। বাংলাদেশে দুটি ঈদ-ই পালিত হয়ে আসছে ধর্মীয় এবং সামাজিকভাবে

ইসলাম ধর্ম চালুর পর থেকে। ধর্মীয় চেতনায় সমৃদ্ধ পবিত্র ঈদের আনন্দ ও উৎসব বাংলাদেশের মুসলমান কবি-সাহিত্যিককে স্পর্শ করবে এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে এটা সত্য যে, বখতিয়ার খিলজীর ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে নদিয়া বিজয়ের পর ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় ঈদ সম্পর্কিত গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, গান, ছড়ার নিদর্শন কমই পাওয়া যায়।

অন্য একটি সূত্রে জানা যায়, ১৯০২ সালে কলকাতার মাসিক 'প্রচারক' পত্রিকায় 'ঈদুল আজহা' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটির লেখক মুনসী মোহাম্মদ আসাদ আলী। এটি সৈয়দ এমদাদ আলীর কবিতার আগেই প্রকাশিত হয়েছে। কারণ সৈয়দ এমদাদ আলীর কবিতাটি ১৯০৩ সালে প্রকাশিত। মুনসী আসাদ আলীর কবিতাটির বৈশিষ্ট্য-এর বিষয় শুধুমাত্র 'ঈদুল আজহা' কেন্দ্রিক। অন্তত নাম থেকে তাই মনে হয়। তবে কবিতাটি দুষ্প্রাপ্য বিধায় এ নিয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনা করা সম্ভব নয়। অন্য দিকে সৈয়দ এমদাদ আলীর প্রথম এবং দ্বিতীয় কবিতাটিও আবর্তিত হয়েছে ঈদের সার্বজনীন আবেদন নিয়ে। দুটো কবিতার কোনোটিতেই 'ঈদুলফিতর' বা 'ঈদুল আজহা'র প্রসঙ্গ নেই।

১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে 'ঈদ'কবিতাটি সৈয়দ এমদাদ আলী লিখেন খিলগাঁও-এ অবস্থানকালে এবং সেটি ছাপা হয় ওই সালেরই ডিসেম্বরে মাসিক 'নবনূর' (কলকাতা)-এর ঈদ সংখ্যায়। কবিতাটির চরণ সংখ্যা ৪৫। কবিতাটির অংশ বিশেষ নিচে দেওয়া হলো:

কুহেলি তিমির সরায়ে দূরে
তরুণ অরুণ উঠিছে ধীরে
রাঙিয়া প্রতি তরুণ শিরে
আজ কি হর্ষ ভরে।

কবিতাটির শেষ চার লাইন হচ্ছে:

জ্ঞান-কর্মের পুজারী হইয়া
সম্মুখে চলিলে সবে,
দীর্ঘ জীবনের জড়তায় রাশি
হবে, অবসান হবে।

সৈয়দ এমদাদ আলীর আলোচ্য দ্বিতীয় কবিতাটির নামও 'ঈদ'। এটি ১৯০৪ সালের নভেম্বরে রচিত খিলগাঁও-এ অবস্থানকালে। লিখেছেন তিনি:

ঈদ সেতো আমাদের ঐক্য সখা...।
বর্ষে বর্ষে দেয় দরশন,
প্রীতির মন্দিরে তার স্মৃতি জাগাইয়া
এসো চেষ্টা করি প্রাণপণ।
আপনারে অপরেরে এসো টেনে লই
সমাজের কাজে দিতে প্রাণ
সকলেরই এক স্বার্থ এক লক্ষ্য হলে
সহায় হবেন রহমান।

ঈদ নিয়ে পরবর্তীকালে আরো বেশ ক'টি কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এ সবের মধ্যে রয়েছে কায়কোবাদের 'ঈদ' (নবনূর, পৌষ ১৩১১), রাম প্রসাদ গুপ্তের 'ঈদুজ্জোহা' (নবনূর, ফাল্গুন, ১৩১১), কায়কোবাদের 'ঈদ আবাহন' (কোহিনূর, আশ্বিন, ১৩১৮), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এসলামবাদীর 'ঈদুল আজহা' (আল এসলাম, ভাদ্র ১৩২৬), কাজী নজরুল ইসলামের 'কোরবানী' (মোসলেম ভারত, ভাদ্র ১৩২৭), আবু লোহানীর ঈদ আহবান, (বঙ্গনূর, আষাঢ়, ১৩২৭), অজ্ঞাতনামা রচিত 'ঈদ' (মোসলেম, ভারত, জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭), খাজা রচিত 'ঈদুলজ্জোহা মোসলেম, ভারত, ভাদ্র ১৩২৭), খান মোহাম্মদ মঈনুদ্দীনের 'ঈদুল ফিতর (সাম্যবাদী, বৈশাখ, ১৩৩২), এ মালেকের 'ঈদ উৎসব' (মোহাম্মদী, বৈশাখ, ১৩৩৫), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর 'ঈদ-অল ফেতর' (সাম্যবাদী, বৈশাখ, ১৩৩১), কাজী নজরুল ইসলামের 'ঈদ মোবারক' (সওগাত, বৈশাখ ১৩৩৪) প্রভৃতি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(১) সৈয়দ এমদাদ আলী: ডালি, ঢাকা, ১৯৬৬।

(২) আনিসুজ্জামান: মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, ঢাকা, ১৯৬৯।

(৩) নজরুল রচনাবলি ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬৬।

ঈদের কবিতা

খুশির ঢল

জান্নাতা নিঝুম শিল্পী

মন ছুটেছে কোন খানে আজ
নেই বাধা আর নেই কোনো লাজ
রঙিন ফুলের গানে,
যেখানে জোনাকি হাসি ফাটিয়ে
আলো দেয় শত বাধা কাটিয়ে
ছুটে যাই তার-ই টানে।

বনের ওপারে আকাশে ঢাকা
সাদা পাহাড়ে নেই তো ফাঁকা
সেখানে উঠেছে চাঁদ,
ছোট্ট মনে বেঁধেছি আশা
শুনব আজই চাঁদের ভাষা
হলাম তাই উন্মাদ।

বলব আমি উঠো কেন চাঁদ
সময় হলে দাও না তো বাধ!
ঐ আকাশের বুকে,
কার কান্না শুনে তুমি যাও?
সুখের তরী কাকে গিয়ে দাও
আছে বুঝি যারা দুখে?

ঈদের খুশির ঢল দিয়ে আজ
ভাঙলে তুমি মনেরও লাজ
ধুয়ে দিলে কালি ধূলি,
সেই সুবাদে তাই তো আমার
মনটা যেন হাজারো বার
সাজাচ্ছে রংতুলি।
রমজানেরই শেষে।

প্রজাপতি ঈদ

নাহার আহমেদ

ঈদ যেন এক প্রজাপতি
আসে বছর ঘুরে
আনন্দেরই বার্তা যে ওর
রঙিন পাখা জুড়ে।
নতুন জামা পরে যে আজ
মিলব গলে গলে
ঈদের নামাজ পড়তে যাব
সবাই দলে দলে।
খুশির হাওয়ায় ডানা মেলে
গাইব ঈদের গান
প্রজাপতি দেয় ভরিয়ে
তাই তো সবার প্রাণ।
নতুন চাঁদের পালকি চড়ে
সবার ঘরে এসে
ছড়ায় হাসি প্রজাপতি
সময় হলে দাও না তো বাধ!

ঈদের ছড়া

দেলওয়ার বিন রশিদ

সন্ধ্যাকাশে চাঁদ উঠেছে
গাইছে পাখি গান
পাখির গানে মধুর সুর
জুড়ায় মন প্রাণ।

চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে
ঈদ হবে কাল
পুব আকাশে উঠবে সূর্য
টকটকে লাল।

শহর গাঁয়ে খুশির হাওয়া
হিংসা-দ্বেষ দূর
ঈদের খুশি সু-ছন্দ
ভালোবাসার সুর।

ঈদ মানে বিলিয়ে দেওয়া
সবই উজাড় করে
ঈদের দিনে সুখ সুরভি
বেহেশ্‌ত হতে ঝরে।

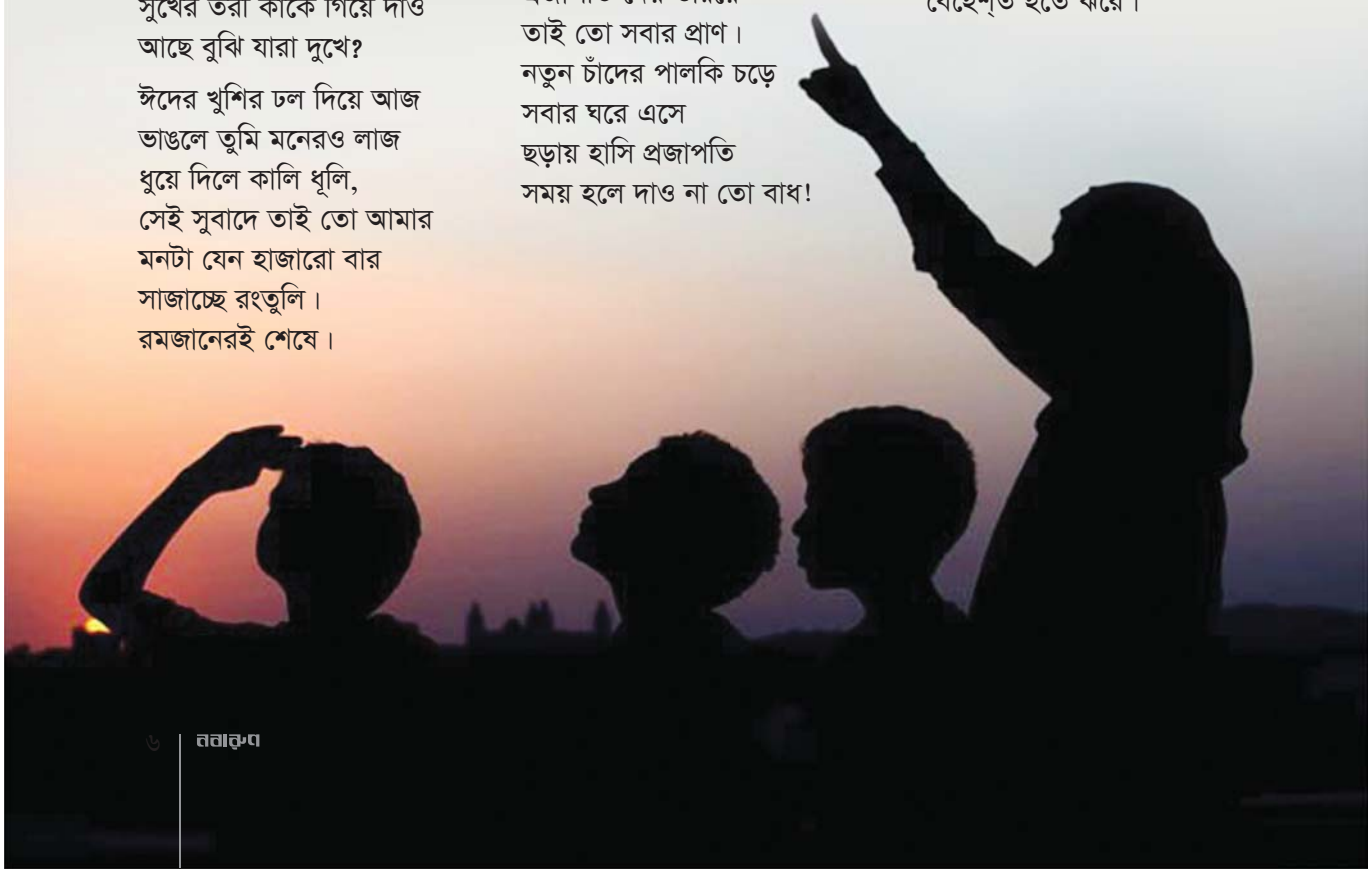

সুজানা চৌধুরী স্নেহা, তৃতীয় শ্রেণি, ইংলিশ ভার্সন, প্রভাতী শাখা, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

দূর আকাশের চাঁদ

ফারুক হাসান

দূর আকাশে চাঁদ
আনলো নতুন বার্তা দিনের
ভাঙলো দুখের বাঁধ।
আকাশ জুড়ে তাই
নামলো খুশির বন্যা দেখি
ফুটন জোছনায়।
জোছনা কেন? জোছনা কেন
নেই তো চোখে নিদ
আজকে আমার তোমার ঘরে
এল খুশির ঈদ।

ঈদের চাঁদ

মো. হাসিবুল হাসান

ঈদের নতুন চাঁদ উঠেছে
নীল আকাশের দেশে
চারদিকে খুশির জোয়ার
উঠছে ভেসে ভেসে।

ছোটো বড়ো সবাই মিলে
মেতেছে হই-হুল্লোড়ে
সম্প্রীতি আর ভালোবাসায়
হিংসা বিদ্বেষ যাবে দূরে।

৮ম শ্রেণি, যাত্রবাড়ি আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

মন যে কেমন করে

পাপিয়া সুলতানা পান্না

ঈদ এসেছে নতুন জামায়
ঈদ এসেছে ঘরে
একফালি চাঁদ দেখতে আমার
মন যে কেমন করে।

মন খুশিতে নাচে আমার
প্রাণ খুশিতে নাচে
মনটা আমার প্রজাপতি
জোনাক পোকার কাছে।

খুশির আমেজ যাক ছড়িয়ে
সবার ঘরে ঘরে
মন যে কেমন করে আমার
প্রাণ যে কেমন করে।

ছোটোদের ঈদ আনন্দ

কালের পরিক্রমায় প্রতিবছর আনন্দ আর খুশির বার্তা নিয়ে ঈদ উৎসবের আগমন ঘটে। ধনীর অট্টালিকা ও গরিবের জীর্ণ কুটিরে ঈদের আনন্দ প্রবাহিত হয় সমভাবে। জেলে-তাঁতি,কামার-কুমার,কুলি-মজুর,ধনী-গরিব সব মুসলমানই সমবেত হয় ঈদের ময়দানে। এক কাতারে দাঁড়িয়ে যায় সবাই। হাতে হাত, বুকে বুক, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরস্পর কোলাকুলি করে পরম মমতা নিয়ে। পুরানো দিনের হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে মুসলমানরা পরস্পর আবদ্ধ হয় ভালোবাসার বন্ধনে।

ঈদ শুধুমাত্র মুসলমানদের উৎসবই নয়, গোটা জাতির জন্য শিক্ষামূলক উৎসবও বটে। সমাজের প্রতিটি মানুষকে সমানভাবে আলোড়িত করে। সবার সঙ্গে আমাদের ছোট্ট সোনামণিদেরও থাকে ঈদকে ঘিরে নানা পরিকল্পনা, প্রস্তুতি। ঈদ এলে তাদের খুশি আর দেখে কে? কতশত প্লান আর কত কী ভাবনা এসে জড়ো হয় তাদের ছোট্ট মনে! ঈদের আনন্দ কেমন লাগে তাদের, কীভাবে কাটে খুশির দিনটি এসব নিয়েই কথা বলে জানাচ্ছেন নবারুণের বন্ধু

রুমান হাফিজ

ঈদের দিন সবার বাড়ি যাই

নিতু চৌধুরী

আমরা যেখান থেকে চাঁদ দেখি সেখানে বাঁশবাগান। তাই চাঁদ দেখতে বার বার লাফ দিতে থাকি। এক সময় বাবাকে ডেকে বলি আমাকে কাঁধে নাও বাবা আমি চাঁদ দেখব। ততক্ষণে দূরের গ্রামের ছেলে মেয়েদের উল্লাস শুরু হয় চারিদিকে যে আনন্দ তা যেন মনকে একেবারে আনন্দময় করে তোলে। ঈদের সকালটি শুরু হয়। সেমাই আর মিষ্টির স্বাদ দিয়ে। তারপর আপাশে যারা সামর্থের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া তাদের সাথে কাপড় বা নগদ সালামি বিনিময় শুরু হয়। দাদা ভাই নিজ হাতে আমাদেরকে ওদের জন্য সালামি দেন এবং আমরা তা দিয়ে আসি। দুপুরের খাবার খেয়ে বের হয়ে পড়ি বাবা-মায়ের সাথে। ঈদের দিনেও একটি কাজ করি মন দিয়ে তা হলো সকলকে শ্রদ্ধা স্বরূপ সালাম করা ও সবার বাড়ি যাওয়া। এটা আমার পরিবারের নিজস্ব কাজ। দিনের শেষে ক্লান্তি নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি আর ঘুম থেকে উঠেই শুরু হয় আক্ষেপ। ইস সময়টি বুঝি চলেই গেল!

ষষ্ঠ শ্রেণি, মাওনা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর

সালামির জন্য অপেক্ষা করি

শাহ্‌রিয়ার সাকিব

ঈদ এলে কত প্লান করতে থাকি। কার থেকে কীভাবে সালামি আদায় করব। এ কাজে আমার সহযোগী চাচাতো ভাই জয়। আমরা দুজন মিলে ঈদ নিয়ে চিন্তাভাবনা শেয়ার করি। ঈদের কয়েকদিন আগেই জমানো শুরু করি খড়কুটো! কারণ, মধ্যরাতে গোসল করে আগুনের তাপে গা শুকাতে হবে যে!

আর লীনা আপুর কাছ থেকে মেহেদি লাগানো তো কোনোভাবেই মিস করা যাবে না। আপু বিরক্ত হয়। আমরা তাকে অনেক ভুলিয়ে টুলিয়ে রাজি করাই। আমাদের হাতে মেহেদি লাগিয়ে দেওয়া শেষ হলেও অন্যদের হাতে লাগানোটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি! মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে আপু ধমক দেয়, কীরে তোদের তো শেষ, এখনো দাঁড়িয়ে আছিস যে! আমরা হেসে হেসে সরে যাই। দ্রুত ঘুমিয়ে পড়ি, কারণ নতুন কাপড় পরে আগে ভাগেই সবার থেকে সালামি নিতে হবে যে!

দশম শ্রেণি, কেজিডিএস উচ্চ বিদ্যালয়, ওসমানীনগর, সিলেট

ঈদে ঘুরাঘুরির সুযোগ হয়

মালিহা আঞ্জুম

চাঁদ রাত থেকেই ঈদের আমেজ শুরু হয়ে যায়। পিঠা-পুলি বানাতে আম্মুকে সাহায্য করি, নতুবা পাশে বসেই দেখতে থাকি। যত দেরিতেই ঘুমাই না কেন ঈদের দিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে যাই এবং ব্যস্ততাও শুরু হয়ে যায় তখনই। বাসায় অতিথিরা আসেন, তাই আমাদের ঈদের দিনে কোথাও বেড়ানোর সুযোগ হয় না। চাঁদ দেখার পর থেকেই হই-হুল্লোড় আরম্ভ হয়, আর ঈদের দিন সালামি পাবার জন্য আমরা ছোটোরা সবাই রীতিমতো প্রতিযোগিতা করে বড়োদেরকে সালাম করা মিস হয় না! ঈদের দিন বিকালে লম্বা একটা ঘুম দেই আর ঘুম থেকে উঠেই দেখি ঈদ শেষ, মানে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সারা বছর অপেক্ষা করি এই দিনটির জন্য। আর এ দিনটি মাত্র কয়েক ঘণ্টাতেই শেষ হয়ে যায়! তবে ঈদের পরের দিন আমার আনন্দ শুরু হয়, এই যে ঘুরাঘুরি!

ষষ্ঠ শ্রেণি, প্রেসিডেন্সি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (ইংরেজি মাধ্যম), চট্টগ্রাম।

পাঞ্জাবি পরে ঈদগাহে যাই

শরীফ ওয়ালিউর রহমান

ঈদের দিন আমার কাছে খুব আনন্দের একটি দিন। এ দিন আমি বাবা-মা ও বোনের সাথে ঘুরতে যাই। আমার বাবা কুমিল্লা থাকেন। আসার সময় আমাদের জন্য অনেক সুন্দর জামাকাপড় নিয়ে আসেন। আম্মুও আমাকে জামা কিনে দেন। আমি অনেক খুশি হই। ছোটো বোন আর আমাকে আম্মু সাজিয়ে দেন। আমরা প্রথমে আম্মু-আব্বুকে সালাম করি। একসাথে খাবার খাই। আব্বুর সাথে পাঞ্জাবি পরে ঈদের নামাজে যাই। বিকালে বেড়াতে যাই। সবাইকে সালাম দেই, সবাই অনেক আদর করে এবং সালামি দেয়। আমার পকেট ভরে যায়!

প্রথম শ্রেণি, স্যার জন উইলসন স্কুল, ঢাকা

ঈদ মানেই দাদু বাড়ি

শাওরিন আহমেদ মাহী

শহরে থাকলেও পড়ালেখার কারণ ছাড়া আর বাইরে বের হওয়ার অবকাশ নেই। কেবল ঈদেই বাইরে বের হওয়ার সুযোগ। আর ঈদ মানেই দাদু বাড়ি। আমার জীবনের বেশিরভাগ ঈদগুলো আমি দাদুর বাড়িতেই কাটিয়েছি। ঈদ মানেই তো পিঠাপুলি, পোলাও, মাংস দিয়ে উদরপূর্তি! সব মিলিয়ে ঈদের দিনগুলো আমার বেশ ভালোই কাটে। তবে এখনকার ঈদের চার-পাঁচদিন পরেই শুরু হয় পরীক্ষা! ঈদের দিনেও এখন আতঙ্ক কাজ করে! তবে যাই হোক, প্রাণ খুলে হাসা আর আনন্দ করার এই দিনটিই মুখ্য দিন বলে আমি মনে করি।

দশম শ্রেণি, বি. কে. জি. সি. সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ

ডিওক্যালিয়নের শেষ রক্ষা

খন্দকার মাহমুদুল হাসান

সে বহুকাল আগের কথা। দৈত্য দানবের ভয়ে তটস্থ থাকত মানুষ। সেই প্রাচীনকালে গ্রিস দেশে দেবতা আর দানবদের নিয়ে বহু গল্প-কাহিনি প্রচলিত ছিল। ডিওক্যালিয়নকে নিয়েও একটা গল্প প্রচলিত ছিল। সেই গল্পটাই শুনব আমরা এখন।

অলিম্পাস পর্বতে তখন বাস করতেন দেবতারা। সেকালের একজন ধার্মিক মানুষের নাম ছিল ডিওক্যালিয়ন। তিনি মানুষের উপকার করতেন। ভালো কাজ করতেন। কারো ক্ষতি করতেন না। তার স্ত্রীও তারই মতো ভালো ছিলেন। এই নারীর নাম ছিল পিরা। খারাপ কিছু করার কথা তিনি ভাবতেনও না।। যেমন তিনি ভালো স্বভাবের ছিলেন, তেমনি সুন্দর ছিল তার চেহারাও।

পিরার মা ছিলেন পৃথিবীর প্রথম নারী প্যান্ডোরা। তিনি পৃথিবীতে আসার সময় যে বাক্স সঙ্গে করে এনেছিলেন তার নামই প্যান্ডোরার বাক্স। ওই বাক্সের মুখ খুলে ফেলাতেই পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল রোগ-ব্যাধি, মারামারি, কাটাকাটি এবং আরো যত খারাপ জিনিস। পৃথিবী জুড়েই তাই ছড়িয়ে পড়েছিল অনাচার। তবে প্যান্ডোরা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দরী ছিলেন। তার মেয়ে পিরাও ছিলেন মায়ের মতোই সুন্দরী। পিরার বাবা ছিলেন টাইটান এপিমেথিউস।

ওদিকে ডিওক্যালিয়ন একজন মানুষ হলেও তার বাবা ছিলেন মানুষের বন্ধু টাইটান প্রমিথিউস, যিনি স্বর্গ থেকে মানুষের জন্য চুপিচুপি আগুন এনে দেবরাজ জিউসের রোষানলে পড়েছিলেন। জিউস তাকে সেজন্য সাজাও দিয়েছিলেন। সেই ঘটনাটা ঘটেছিল স্বর্গের প্রভুত্ব নিয়ে দেবতা ও টাইটানদের রেষারেষির পরে। সেই রেষারেষিতে অবশ্য জিতেছিলেন দেবতারা। ডিওক্যালিয়নের মাও সাধারণ কেউ ছিলেন না। তার নাম ছিল প্রোনোয়া। তিনি ছিলেন ওসেনিড।

তো, সেসময় গ্রিসের আর্কাডিয়ায় রাজত্ব করতেন লাইক্যায়ন। তিনি ছিলেন খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। তার ছিল পঞ্চাশ জন ছেলে। এদের প্রত্যেকেই ছিল মহাদুষ্ট। হেন খারাপ কাজ নেই যা এই ছেলেরা করত না। প্রজারাও তাই দেখে খারাপ কাজে আশকারা পেত। দিনে দিনে বেড়েই চলল তাদের অপকর্ম। প্যান্ডোরার বাক্সে মন্দ জিনিসগুলো যেন একসঙ্গে ঘাঁটি গেড়েছিল ওই রাজ্যে। দেবতারা লক্ষ্য করছিলেন সেসব। লক্ষ্য করছিলেন দেবরাজ জিউসও। তিনি ঠিক করলেন, ওই রাজ্যে যাবেন। নিজ চোখে দেখবেন সবকিছু। যাবার আগে কাউকে কাউকে নিজের ইচ্ছের কথা জানিয়েও রাখলেন। আর কেউ কেউ যেহেতু জানতে পেরেছিল যে জিউস আসবেন, তাই তাদের মধ্যে কেউ কেউ লোক দেখানো ভালো কাজ করতে শুরু করলো। কেউবা ধুমধাম করে পূজাও করতে লাগল জিউসের। জিউস বুঝলেন সবই। এ অবস্থায় একদিন তিনি স্বর্গ থেকে এলেন সেই আর্কাডিয়া রাজ্যে। তিনি এলেন মানুষের ছদ্মবেশে। রাজপ্রাসাদেও গেলেন। রাজার সেই দুষ্ট পুত্ররা একটা ছেলেকে হত্যা করল, তারপর সেই ছেলের মাংস খেতে দিলো জিউসকে। এই অপকর্ম দেখে দেবরাজ তো মহাখাপ্পা। তিনি তৎক্ষণাৎ লাইক্যায়ন ও একজন বাদে (সেই একজনের নাম ছিল নিকতিমস) তার সব ছেলেকে বানিয়ে দিলেন নেকড়ে মানব। তারপর আকাশ থেকে নামালেন ভীষণ বজ্রবৃষ্টি। সেই বজ্রবৃষ্টির তোড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল রাজপ্রাসাদ।

ধূলিসাৎ হয়ে গেল প্রাসাদ। কিন্তু জিউসের রাগ তাতেও কমল না। সমুদ্রদেবতা পসাইডনকে বললেন, মহাপ্লাবন সৃষ্টি করতে। অন্যান্য দেবতাদেরকেও বললেন রাজপ্রাসাদের মতোই ধ্বংস করে দিতে সব বাড়িঘর। দেবতাদের রোষ বলে কথা। শুরু হলো প্রবল বর্ষণ। দিন নেই রাত নেই। তুমুল বর্ষণ হচ্ছে তো হচ্ছেই। পথঘাট ডুবে গেল, ঘরবাড়ি তলিয়ে গেল। বাড়তেই লাগল জল। আর মারা পড়তে লাগল মানুষ। শুধু মানুষ কেন, পশুপাখি গাছপালাসহ সমস্ত জীবকুলই উজাড় হওয়ার উপক্রম হলো। ওদিকে ডিওক্যালিয়ন ছিলেন ধার্মিক মানুষ। তিনি মানুষের উপকার করতেন। কারো ক্ষতি করতেন না। তার বাবা প্রমিথিউসকে দেখার জন্য প্রতি বছর তিনি ককেশাস পাহাড়ে যেতেন। প্রমিথিউস সেখানে বন্দি ছিলেন। ছেলেকে তিনি বলতেন, পাপাচারী মানুষের পাপের পাল্লা অনেক ভারি হয়েছে। এবারে তাদের সাজার পালা। তাই মহাপ্লাবনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। বাবার এই সাবধান বাণী শুনে ডিওক্যালিয়ন আগেভাগেই একটি নৌকো বানিয়ে ফেললেন। প্লাবন শুরু হতেই স্ত্রী পিরাকে নিয়ে নৌকোয় চেপে বসলেন

তিনি। মহাপ্লাবনের প্রবল জলের তোড়ে সবকিছু তলিয়ে গেলেও ভেসে রইল শুধু এই নৌকো। নয় দিন নয় রাত ভাসতে থাকার পর সেই তরি এসে ভিড়ল পার্নাসাস পাহাড়ের চূড়ায়।

ওদিকে প্লাবনের জল কমতে শুরু করল। ধার্মিক ও সৎ ডিওক্যালিয়ন এবং পিরা জিউসের অনুগ্রহ লাভ করলেন। দেবরাজ তাদেরকে ধ্বংস করলেন না। এইবারে তারা পাহাড় চূড়া থেকে নামতে শুরু করলেন। চারদিকে তাকিয়ে দুঃখে ভরে উঠল তাদের মন। গোটা পৃথিবীটাই এক মহা ধ্বংসস্তূপ। যতদূর দৃষ্টি যায় ধু-ধু প্রান্তর। মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি কিছুই নেই। জীবকুলের কাউকেই তারা জীবিত পেলেন না। অবশ্য অল্পসংখ্যক মানুষ রক্ষা পেয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল জিউসের পুত্র মেগেরাস। সারস পাখির ডাক শুনে তার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। আর তাতেই সে জেরানিয়া পাহাড়ের চূড়ায় উঠে প্রাণরক্ষার সুযোগ পেয়ে যায়। আর পেলিওনের কেরাম্বাস পাহাড় চূড়ায় উঠে রক্ষা পেয়েছিল। নিম্ফের সাহায্যে সে পেয়েছিল ডানা। এ ছাড়া পারন্যাসাস পাহাড়ের অধিবাসীরাও রক্ষা পেয়েছিল। পারন্যাসাস ছিলেন সমুদ্রদেব পসাইডনের ছেলে।

উঁচু পাহাড় থেকে নিচে নামতে নামতে ডিওক্যালিয়ন ও পিরা থেমিসের মন্দিরে এসে হাজির হলেন। তারা দেখলেন, মন্দিরটা তখনো কোনোরকমে টিকে আছে। কিন্তু ধ্বংস হয়ে যায় যায় অবস্থা। চারধারে ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসস্তূপ। জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নেই। এই দৃশ্য দেখে দুঃখে তারা ভেঙে পড়লেন। তারা কার সঙ্গে কথা বলবেন? সঙ্গী - প্রতিবেশী - সমাজ ছাড়া কি মানুষ বাঁচতে পারে?

তারা দুজনেই তখন প্রার্থনা করলেন মানুষ চেয়ে। এমন সময় হঠাৎ বুঝতে পারলেন কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। তারা পেছনে তাকাতেই দেখলেন, দীর্ঘদেহী একজন দাঁড়িয়ে। অথচ একটু আগেই কেউই ছিল না সেখানে। তার চোখ নীল। চুল সোনালি। জুতো আর টুপিতে লাগানো আছে ডানা– হাতে একটা জিনিস আছে, যাতে জড়ানো রয়েছে সোনালি রঙের সাপ। সে হঠাৎ করেই বলে উঠল, তোমাদের মাথা ঢেকে ফেল, আর মায়ের হাড়গুলো ছুঁড়ে ফেল পেছনে।

কথা শেষ হতেই অদৃশ্য হয়ে গেল আগন্তুক। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেলেন তারা। তবে বুঝতে পারলেন যে, নিশ্চয় দেবদূত বা স্বয়ং কোনো দেবতা বা দেবী এসেছিলেন। এরপর ভাবলেন, মাথা না হয় ঢাকলেন, কিন্তু মায়ের হাড় ছুড়ে ফেলবেন কী করে? আর তাদের দুজনের মাও তো আলাদা। তাছাড়া তারা মারাও গেছেন অনেক আগে। শেষে অনেক মাথা খাটিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, ধরিত্রী অর্থাৎ পৃথিবী হলো সকলের মা। মায়ের হাড় মানে পাথর। এইবারে তারা নির্দেশ মোতাবেক নদীর ধারের পাথরগুলো একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা পাথর থেকে জন্ম নিতে লাগল একেকজন করে মানুষ। ডিওক্যালিয়ন যে পাথরগুলো ছুঁড়ছিলেন সেগুলো থেকে সৃষ্টি হচ্ছিল পুরুষ মানুষ। আর পিরা যেগুলো ছুঁড়ছিলেন সেগুলো থেকে সৃষ্টি হচ্ছিল নারী। তবে এসব মানুষও সাধারণ মানুষ ছিল না। তাদের দেহে ছিল অনেক বল। পাথর থেকে জন্ম নেওয়া মানুষ তো! বল একটু বেশি হবেই। তাছাড়া শূন্য থেকে যাত্রা করতে হবে, গড়তে হবে নতুন পৃথিবী। সেই পৃথিবী গড়ার যোগ্য মানুষই তারা ছিল।

ওদিকে ডিওক্যালিয়ন এবং পিরারও একটি সন্তান হলো। নাম তার হেলেন। এই হেলেন থেকেই পরে এক জাতি ও সভ্যতার সৃষ্টি হলো, সেই সভ্যতা হলো গ্রিসদেশের প্রাচীন হেলেনিক বা হেলেনীয় সভ্যতা।

এখানে একটা কথা, মহাপ্লাবনের কাহিনি শুধু গ্রিক পুরাণেই নয়, মেসোপটেমীয় পুরাণেও আছে এবং কাহিনিগুলোর মধ্যে মিলও আছে।

এই কাহিনির শিক্ষা

চোরের দশদিন, সাধুর একদিন। অন্যায় - অবিচার করলে তার সাজা একদিন পেতেই হয়। সৎকর্ম করলে তারও পুরস্কার পাওয়া যায়।

আজগুবি এক বাঘের গল্প

মোহাম্মদ শাহ আলম

এই গল্পটা শুনেছি যার কাছ থেকে তার নাম নরপু। নামটা কেমন না! লোকটাও কিন্তু কেমন জানি। কোনো কথা বলে না। সারাক্ষণ চুপচাপ থাকে। আর গল্পটা হলো এক বাঘ নিয়ে। আজগুবি এক বাঘ। সেই গল্পই বলব, তবে তার আগে নরপু সম্পর্কে কিছু বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

নরপুর সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল থিম্পু নামের একটা শহরে। জানো তো কোথায় শহরটা? আমাদের পাশের দেশ ভুটানের রাজধানী থিম্পু। আমরা সেখানে গিয়েছিলাম বেড়াতে। প্লেন থেকে নেমে এয়ারপোর্টের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি ট্যাক্সির জন্য। যাব একটা হোটেলে। ওখানেই রাতে থাকব। ওখানে থেকে ঘুরে ঘুরে দেশটা দেখব। একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে হাত তুলে ডাকতে যাব, এমন সময় একটা লোক এসে হাজির। স্যার গাড়ি লাগবে?

লোকটা বাংলায় কথা বলছে। শুনে তো আমি অবাক। লোকটা নিজের থেকেই বলল,স্যার, অবাক হবেন না। আমি ভালো বাংলা বলতে পারি। বাংলাদেশ থেকে অনেক লোক আসে এদেশে। তাদের জন্য দরকার হয় বাংলাভাষী গাইড। আমি এখানে গাইডের কাজ করি। তাছাড়া আমি বাংলাদেশে ছিলাম বেশ কয়েক বছর। থাকতাম সাভারের হেমায়েতপুরে। ওখানে একটা গার্মেন্টসে কাজ করতাম। কাজ মানে দোভাষীর কাজ। চীন দেশ থেকে আসা মানুষদের কথা ইংরেজিতে বুঝিয়ে দিতাম। ওখানে থাকতে থাকতে বাংলায় কথা বলা শিখে ফেলেছি। খুবই সুন্দর এবং মিষ্টি তোমাদের দেশের ভাষা। কী সুন্দর করে যে তোমরা বলো, কী খবর? কেমন আছ?

লোকটার কথা শুনে আমার ভালো লাগল। তাকে বললাম, জি, গাড়ি লাগবে।

কোনো সমস্যা নেই। একটু দাঁড়ান। গাড়ি চলে আসবে। বলল লোকটা। তারপর সে কাকে যেন ফোন করল। ঠিক এক মিনিটের মধ্যেই একটা গাড়ি আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নামল ড্রাইভার। গাইড লোকটা ড্রাইভারের সাথে কথা বলল। তারপর আমাদের বলল, এর নাম নরপু। নরপু আপনাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেশ দেখাবে। আপনারা গাড়িতে উঠুন।

নরপু গাড়ির দরজা খুলে দিল। কোনো কথা বলল না।

আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি চলতে লাগল। কী যে অপরূপ দৃশ্য তা বলে শেষ করা যাবে না। দেখতে দেখতে কখন যে হোটেলে পৌঁছে গেছি টেরই পাইনি। সারাটা পথ নরপু কোনো কথা বলেনি। একদম চুপচাপ। কিন্তু ঠিকঠিক আমাদের হোটেলে নামিয়ে দিল। তারপর একটা ছোট্ট নোটবুক খুলে কী যেন লিখল। লেখাটা আমাকে দেখাল - ৪:৩০ মিনিট। সিটি ট্যুর। আমরা বুঝে গেলাম, ফ্রেশ হয়ে সাড়ে চারটায় বেরোতে হবে। আমি বললাম ধন্যবাদ। নরপু হাসল। নীরব হাসি।

আমি জানি, তোমরা বাঘের গল্পটা শোনার জন্য বসে আছ। কিন্তু নরপুকে নিয়ে আমার যে আরো কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। তার মানে আমার বলতেই হবে। কারণ হলো, এই নরপু লোকটা অদ্ভুত। এখন পর্যন্ত আমার সাথে বা আমাদের কারো সাথেই সে কথা বলেনি। কিছু জানতে চাইলে একটা হাসি দেয়। মুচকি হাসি। নীরব হাসি। তারপর তার সেই ছোট্ট নোটবুকটা খুলে কিছু একটা লিখে দেয়। সময় এবং কোথায় যাবে সে জায়গার নাম। ইংরেজিতে। একদিনের মধ্যেই আমরা বুঝে গিয়েছি সময়ের ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে না। আর ভাবতে হবে না, আমরা কোথায় কোথায় যাব তা নিয়ে। কারণ নরপু সব ঠিকঠাক করে রেখেছে। আর তাই আমরাও কিছু ভাবিনি। তিন দিন আমরা তার সাথে ছিলাম এবং এই তিন দিনে সে আমাদের অনেক দর্শনীয় স্থান ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। যেসব জায়গা দেখব বলে লিস্ট করে গিয়েছিলাম, আমরা মিলিয়ে দেখেছি কোনো জায়গাই আমাদের দেখা বাদ পড়েনি। যেমন, পুনাখা ঝং, তাসিছো ঝং, দোচালা পাস, চেলেলা পাস, চমলহারিসহ আরো অনেক জায়গা। প্রতিটি জায়গা যে কী অপরূপ সুন্দর তা বলতে হলে বাঘের গল্প বলা বাদ দিয়ে ভ্রমণ কাহিনি লিখতে হবে। তোমরা শুনতে চাইলে সে গল্প আরেক দিন বলা যাবে।

এই যে নরপুর কথা বলছি, যে গত তিন দিন ধরে আমাদের সাথে, যার সাথে নানান জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছি, যার মুখ থেকে একটা কথাও বেরোয়নি, সে কী না হঠাৎ বলে উঠল – এই পাহাড়ের একটা গল্প আছে শুনবেন? বলল তো বলল, তাও আবার খাঁটি বাংলায়। কি অবাক হচ্ছো? অবাক হবারই কথা। আমরা তো অবাক হয়েছিলাম রোদেলা দিনে বজ্রপাত দেখার মতো।

ঘটনাটা ঘটল আমরা যেদিন বাংলাদেশে চলে আসব সেদিন। বিকেলে আমাদের বিমান। সকাল সকাল ঘুরতে যাবার কথা। নরপু কাল সন্ধ্যায় তার নোটবুকে লিখে দেখিয়েছিল - ৮:৩০ মিনিট, টাইগার নেস্ট। তো আমরা সবাই সকাল নয়টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম টাইগার নেস্ট পাহাড়ের পাদদেশে। আমরা মনে মনে ভাবছি বাঘ-টাগ কিছু দেখব কিন্তু এ তো দেখি উঁচু এক পাহাড়। আর পাহাড়ের একদম চূড়ায় কয়েকটা দালান। এখানে এসে জানলাম মানুষ পাহাড়ের এই নিচ থেকে কয়েক ঘণ্টা হেঁটে ঐ চূড়ায় ওঠে। কিছু লোককে দেখলাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাচ্ছে। আমরা ঠিক করলাম পাহাড়ে উঠব না। নিচে বসে বসেই কিছুক্ষণ দেখে হোটেলে চলে যাব। ঠিক এমন সময় নরপু এসে বলল, এই পাহাড়ের একটা গল্প আছে শুনবেন?

আমরা অবাক হওয়া বাদ দিয়ে বললাম, শুনব। এবার নরপু তার গল্প বলা শুরু করল।

শুনুন তাহলে, গল্পটা আসলে পাহাড়ের না। গল্পটা একজন সাধুর। আর একটা বাঘের। সে ম্যালা দিন আগের কথা। প্রায় একহাজার বছর আগের।

পদ্মসম্ভবা নামের এক সাধু এসেছিল এই পারো এলাকায়। মানে যে এলাকায় এখন আমরা আছি এই এলাকার নাম পারো। আর এই টাইগার নেস্ট পাহাড়টা পারো এলাকার ভিতরে। এই পারো এলাকায় হাজার বছর আগে রাক্ষসদের খুব উৎপাত ছিল। মানুষ ছিল চরম বিপদে। ঘর থেকে বের হতে পারে না, বাজারে যেতে পারে না, জমিতে কাজ করতে যেতে পারে না, বাচ্চারা উঠানে খেলতে যেতে পারে না। কেউ ঘর থেকে বের হলেই রাক্ষস এসে ধরে নিয়ে যায়। এ রকম এক ভয়ানক অবস্থায় এই পারো এলাকার মানুষ জানতে পারল তিব্বত নামের এক দেশে এক সাধু আছে, নাম পদ্মসম্ভবা, একমাত্র সেই সাধুই পারে এই রাক্ষসের হাত থেকে পারোবাসীকে বাঁচাতে। মাসের পর মাস হেঁটে একদল যুবক এই পারো থেকে গিয়ে পৌঁছোলো তিব্বতে। ওরা গেল ঠিকই কিন্তু পদ্মসম্ভবা নামে কোনো সাধুর সন্ধান পেল না। নিরাশ হয়ে যখন যুবকেরা ফিরে আসবে তখন তিব্বতের একদল লোক তাদের কথা মন দিয়ে শুনল। তারপর তারা বলল, থাকো তোমরা আরো একদিন। আমাদের এখানে এক সাধু আছে তার নাম রিনপোশে। আমরা তোমাদের সাধু রিনপোশের কাছে নিয়ে যাব। আমাদের এলাকার সকল রাক্ষস তাড়িয়েছেন এই সাধু রিনপোশে। খুব ভোরে যেতে হবে। সূর্য ওঠার আগে তিব্বতের লোকেরা ঐ যুবকদের নিয়ে গেল সাধুর কাছে। সব শুনে সাধু বলল, আমিই সাধু পদ্মসম্ভবা। আমি যাব তোমাদের পারো। তোমরা চলে যাও। আমি ঠিকমতো পৌঁছে যাব। যুবকেরা চলে আসার আগে শুধু বলল, গুরুজি, রাক্ষসেরা আমাদের সব শেষ করে দিচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পারেন আসবেন। আমাদের রক্ষা করবেন।

নরপু

সাধু পদ্মসম্ভবা ছিলেন ভারতের উড়িষ্যার মানুষ। অনেক বছর সাধনা করে তিনি সাধু হয়েছিলেন। মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য। উড়িষ্যার মানুষকে রাক্ষসদের হাত থেকে রক্ষা করতে তিনি গিয়েছিলেন তিব্বতে। গিয়েছিলেন বলা ঠিক হবে না। আসলে ওনাকে নেওয়ার জন্য তিব্বত থেকে শত শত লোক এসেছিল। ঐ একই কারণে। রাক্ষসদের হাত থেকে তিব্বতবাসীকে বাঁচানোর জন্য।

পারোর সেই যুবকেরা আবারো মাসের পর মাস হেঁটে ফিরে এল তাদের নিজ দেশে। এসে তো তারা অবাক। কারো চোখে-মুখে কোনো ভয় নেই। পারোর সকল মানুষজন হাসিখুশি। মাঠে কাজ করছে, নদীতে মাছ

ধরছে, বাচ্চারা খেলছে। তবে কি ওরা শুধু শুধুই এত দূর গিয়েছিল? পরে ওরা শুনতে পেল এক মহাসাধু এসেছেন এই পারোতে। কয়েক মাস আগে। এসে সকল রাক্ষসদের পাখি বানিয়ে দিয়েছেন। এখন আর রাক্ষসদের উৎপাত নেই। ওরা আরো শুনতে পেল, সেই সাধুর নাম পদ্মসম্ভবা। ওরা ভেবে পেল না, এ কী করে সম্ভব। যে পথ তারা পাড়ি দিয়েছে মাসের পর মাস হেঁটে, কী করে সাধু পদ্মসম্ভবা চলে এসেছে কয়েক মাস আগেই!

কী করে! আসলে সাধু পদ্মসম্ভবার আসতে সময় লেগেছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা। তিনি এসেছেন একটি উড়ন্ত বাঘের পিঠে চড়ে। সে আরেক কাহিনি। যুবকেরা রওনা হওয়ার পরপরই সাধু রওনা দিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে। তিনি হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে এক গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় আসে এক বাঘ। সাধুকে খাবে। বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়বে সাধুর উপর, এমন সময় সাধু একমুঠো ধুলা ছুড়ে মারেন বাঘের দিকে। সাথে সাথে বাঘটা বলে ওঠে, কী করতে হবে বলুন গুরুজি। তখন সাধু বলল, আমাকে দুই ঘণ্টার মধ্যে পারো নামের জায়গায় নিয়ে যাও। বাঘটা এমনভাবে উড়েছিল এক ঘন্টাও নাকি লাগেনি পারো পৌঁছুতে। পারো পৌঁছেই একমুঠো ধুলা নিয়ে বাঘকে বলল সাধু, আমাকে ঐ পাহাড়ের উপরে নিয়ে চল। পাহাড়ের উপরে গিয়ে সাধু পদ্মসম্ভবা তার হাতে রাখা ধুলা ছড়িয়ে দিল আকাশে। আর তখনই হাজার হাজার পাখি উড়তে লাগল আকাশে। আর কোনোদিন পারোতে রাক্ষসের দেখা কেউ পায়নি।

পরে জানা গেছে ঐ পাহাড়ে সাধু পদ্মসম্ভবা আর ঐ বাঘটা তিন মাস বসবাস করেছেন। সেই থেকে এই পাহাড়টার নাম টাইগার নেস্ট। মানে বাঘের বাসা। তোমরা যদি কোনোদিন ভুটান যাও তবে অবশ্যই পারোর টাইগার নেস্ট দেখে এসো।

গল্প শেষ হলে নরপু আবার হাসল। নীরব হাসি। পরে আমাদের হোটেলে নিয়ে গেল। বিকালে পারো বিমানবন্দরে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিল নরপু - কোনো কথা ছাড়াই। কথা না বলা নরপু আমাদের মনে চিরতরে ঠাঁই করে নিয়েছে।

লাঠি যার মোষ তার

সালেহীন আহমেদ সাহিব

এক গ্রামে বাস করত এক লোক। নাম ছিল নাট্টু। সে অনেক মোষ পালন করত। মোষের দুধ বিক্রি করে প্রতি বছর নতুন মোষ কিনতো। এই বছরও নাট্টু পশু মেলা থেকে একটি মোষ কিনে বাড়ি ফিরছিল । বাড়ি যাওয়ার জন্য একটা জঙ্গল পার হতে হয়। জঙ্গল দিয়ে যাওয়ার সময় একজন লোকের সাথে তার দেখা হলো। লোকটির হাতে ছিল একটি লাঠি। নাট্টুকে লোকটি বলল, তোমার মোষটি আমাকে দিয়ে দাও। না দিলে আমি তোমাকে লাঠি দিয়ে মারব। নাট্টু ভয় পেয়ে গেল। অবশেষে নাট্টু তার মোষ লোকটিকে দিয়ে দিল। নাট্টু হতাশ মনে বলল– আমি তোমাকে মোষ দিয়েছি, তোমার লাঠিটা আমাকে দাও। লোকটি খুশি হয়ে নাট্টুকে লাঠিটা দিয়ে দিল। নাট্টুর মাথায় হঠাৎ একটি বুদ্ধি আসলো। নাট্টু বলল, আমার মোষ আমাকে দাও। না দিলে লাঠি দিয়ে মারব। লোকটি ভয় পেয়ে নাট্টুকে মোষটি দিয়ে দিল। এবার লোকটি বলল, আমার লাঠিটা দিয়ে দাও। নাট্টু বলল, না 'লাঠি যার মোষ তার'।

ষষ্ঠ শ্রেণি, কুতুবদিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, কুতুবদিয়া, কক্সবাজার

ভালো মানুষ হও

—লোটে শেরিং, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

বন্ধুরা, তোমরা কি জানো লোটে শেরিং কে? তিনি হলেন ভুটানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। তিনি ২০১৮ সালের ৭ই নভেম্বর ভুটানের প্রধানমন্ত্রী হন। ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ২৮তম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন লোটে শেরিং। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে চার দিনের সরকারি সফরে ১২ই এপ্রিল ঢাকায় আসেন তিনি। বাংলাদেশে এটিই তাঁর প্রথম সফর।

লোটে শেরিং তাঁর সফরকালে বাংলাদেশের পহেলা বৈশাখের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন, গিয়েছেন তাঁর পুরনো শিক্ষাঙ্গণেও। অনুষ্ঠানগুলোতে তিনি পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন, হাসিয়েছেন, বলেছেন অনেক সুন্দর উৎসাহব্যঞ্জক কথা। বন্ধুরা, তোমাদের জন্য লোটে শেরিং-এর বক্তব্যের চুম্বক অংশ তুলে ধরলাম:

❑ভালো চিকিৎসক হওয়ার প্রথম শর্ত— ভালো মানুষ হও।

❑আপনি যদি জীবনে কিছু শিখতে চান, তাহলে পড়ে শিখতে পারবেন না। আপনাকে আলোচনা করতে হবে। লেকচার থেকে শেখা যায়, একথা আমি বিশ্বাস করি না। অতএব আমার লেকচারে কান দিবেন না।

❑সব ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

❑আমরা রোগীদের সঙ্গে সবসময় থাকি। কিন্তু রোগীরা আমাদের সাথে সবসময় থাকে না। তারা আমাদের কাছে একবারই আসে। সেজন্য প্রত্যেক রোগীকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত।

❑ মানুষ বলে, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হও। আমি বলি, না। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার দরকার নেই। ভালো মানুষ হও। তোমার কাছে যেটা ঠিক মনে হয়, তাই করো। নিজের সেরাটা দাও।

❑ রোগীকে দেখতে হলে ভালো করে দেখতে হবে। ঝটপট একটা প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিলে ডায়াগনোসিস ভুল হয়ে যায়।

❑ আমাদের জীবনে শিক্ষকদের ভূমিকা অনেক বড়ো। ছাত্রজীবনে আমরা সেটা বুঝি না। যখন বুঝি ততদিনে অনেক দেরি হয়ে যায়। অতএব শিক্ষার্থীরা, শিক্ষকেরা সবসময় তোমাদের পাশে আছেন। এই সুযোগটা কাজে লাগাও।

অচেনা জুতো জোড়া

আহমেদ রিয়াজ

জুতো জোড়া পড়েছিল ঘরের দরজায়। অচেনা জুতো।

নাবিন চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, জুতো জোড়া কার?'

মা দেখে বললেন, 'জানি না তো!'

'কোত্থেকে এল?'

বিরক্ত হলেন মা। 'সেটা জানলে তো জুতোর মালিকের খবরটাও জানতাম। মনে হয় পুরনো জুতোঅলা ফেলে গেছে।'

অবাক হলো নাবিন, 'পুরনো জুতোঅলা!'

'হুঁ। ঘরে অনেক পুরনো জুতো ছিল। বেচে দিয়েছি। হয়ত ওই লোকটি ফেলে গেছে। থাক ওখানে। আবার এলে ফেরত নিয়ে যাবে।'

ঘরের সদর দরজার পাশে পড়ে রইল জুতো জোড়া।

সেদিন বিকেলেও ছিল। খেলতে যাওয়ার সময় দেখল নাবিন।

খেলা থেকে ফেরার সময়ও ছিল।

পরদিন সকালেও ছিল। স্কুলে যাওয়ার সময়ও দেখেছিল।

দুপুরেও ছিল। স্কুল থেকে ফেরার সময়ও দেখেছিল।

বিকেলে, সন্ধ্যায়...

পরদিন...

তার পরদিন...

তারও পরদিন...

অনেক দিন ধরেই ছিল। ওভাবেই পড়েছিল।

নাহ্! অনেক দিন তো হয়ে গেল। জুতো জোড়া কেউ নিতে এল না। এমনকি চোরও ওই জুতো ছুঁয়ে দেখল না। জুতোর উপর জমল আরো ধুলোবালি।

তারও অনেক দিন পর এক সকালে। জুতো জোড়া নিয়ে কিছু একটা করতে লাগল নাবিন। দেখেই চেঁচিয়ে ওঠলেন মা, 'কী করিস?'

'কিছু না।'

'জুতো জোড়া ধরেছিস কেন? কার না কার জুতো!'

ঘরের সামনে লম্বা একটু জায়গা। দু-তিনটা গাছ আছে ওখানটায়। জুতো জোড়ার ভিতরটা মাটি দিয়ে ভরল নাবিন। শুকনো গোবর দিল। টব বানিয়ে ফেলল জুতো জোড়াকে। জুতো টব। আর ওভাবেই রেখে দিল জানালার নিচে। ভাবতে লাগল, জুতোর ভিতরে বীজ বুনবে? নাকি চারা।

জুতো দুটো বিশাল আকারের। জুতোর মালিকের পা দুটো নিশ্চয়ই বিশাল! ওর বাবার পায়ের দ্বিগুণ। এত বড়ো পা হয় মানুষের! বড্ড অবাক হলো নাবিন।

মাটি ভরা জুতো জোড়া ওভাবেই পড়ে রইল আরো কিছুদিন।

তারপর আরো কিছুদিন।

বসন্ত পেরিয়ে গ্রীষ্ম এল।

গ্রীষ্ম শেষে বর্ষা। জুতো জোড়ার কথা কি ভুলে গেল নাবিন?

হতে পারে। স্কুলের পড়া। কোচিংয়ের পড়া। পড়ার চাপে সত্যি ভুলেই গিয়েছে ও।

কিন্তু সেদিন সকালে। স্কুলে যাওয়ার পথে হঠাৎ চোখ পড়ল জুতো টবে। আর অমনি অবাক হয়ে গেল ও। দুটো জুতো থেকে দুটো চারা গজিয়েছে। কী সুন্দর! চিরল চিরল পাতা। কৃষ্ণচূড়া পাতার মতো। দৌড়ে ঘরে গেল নাবিন। জানতে চাইল, 'মা, আমার জুতো টবে কি চারা লাগিয়েছ?'

মা বললেন, 'না তো!'

'তবে কি বাবা লাগিয়েছেন?'

'জানি না। তোর বাবা এলে জিজ্ঞেস করিস।'

বাবা ফেরার পর জিজ্ঞেস করল নাবিন। 'বাবা, জুতো টবে কি তুমি চারা লাগিয়েছ?'

বাবা ওর কথা শুনে তো অবাক। চোখ দুটো কপালে তুলে দিয়ে বললেন, 'কী বলছিস কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি চারাগাছ কোথায় পাব? আর জুতো টব! সেটা আবার কী জিনিস?'

নাহ্! বাবা লাগাননি। তাহলে কে লাগাল? বড্ড চিন্তায় পড়ে গেল নাবিন। বাইরে থেকে কেউ এসে কি লাগাতে পারে? উঁহুঁ। কারো তো খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। ধ্যাত!

পরদিন সকালে গাছ দুটোর দিকে তাকিয়ে নাবিন অবাক হলো। আরে! গাছ দুটো আরো বড়ো হয়েছে। এত তাড়াতাড়ি গাছ বড়ো হয়! তারপরের দিন আরো বড়ো।

তার পরের দিন আরো বড়ো। যতই দিন যেতে লাগল, ধেই ধেই করে বেড়ে উঠতে লাগল গাছ দুটো এবং আরেকটা বিষয় খুব অবাক করার মতো। গাছ দুটো জড়াজড়ি করে বড়ো হচ্ছে। লতানো গাছের মতো। একটা গাছ আরেকটা গাছকে জড়িয়ে ধরে আছে। জড়াজড়ি করে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে বড়ো হচ্ছে। দেখে খুব ভালো লাগল নাবিনের। গাছেদের মধ্যেও এত মিল! বাহ্! দুটো গাছ, কিন্তু দেখে মনে হয় একটা।

সেই এক গাছ হওয়া গাছ দুটো আরো বড়ো হলো। কয়েকদিনেই ছাড়িয়ে গেল চারতলা বাড়ির ছাদ। ছাদ পেরিয়ে বড়ো হতে হতে হতে...

নাহ্! আর বেশি বড়ো হলো না।

নাবিন একদিন জানতে চাইল, 'মা, ওটা কী গাছ?'

মা গাছের দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'মনে হয় কৃষ্ণচূড়া। পাতা তো কৃষ্ণচূড়ার মতো।'

বাবা বললেন, 'কিন্তু কৃষ্ণচূড়া কী এমন লতানো হয়?'

'তাই তো!'

মা বললেন, 'তাহলে আমি বলতে পারব না।'

চেনা-পরিচিত অনেকের কাছেই জানতে চাইল নাবিন। কিন্তু কেউ গাছটার নাম বলতে পারল না। গাছটা নিয়ে আসলে কারো মাথাব্যথাও নেই।

সেই বসন্তেই গাছে ফুল ফুটল। আজব ফুল। কিন্তু

কেউ সে ফুলের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। দু-দিন কেবল নাবিনই তাকিয়ে দেখেছে। তারও কিছুদিন পর গাছে ফল ধরল। কেমন ফল?

নিচে থেকে তাকিয়ে অনেকেই ভাবল, কৃষ্ণচূড়া ফল। একদিন সেই কৃষ্ণচূড়া ফল নিচে পড়ল। ধুপুস করে। তা-ও নাবিনের সামনে। দেখেই অবাক হয়ে গেল নাবিন? আরে! এটা তো...!

সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ফল পড়ল। ফল দুটো নিয়ে দৌড়ে ঘরের ভিতর গেল নাবিন। বাবার সামনে নিয়ে রাখল ফল দুটো। বলল, 'হুঁ। এতদিন তো কেউ গাছটার নামও বলতে পারলে না। এই দেখো গাছের ফল।'

ফল দুটো দেখে বাবা-মা দুজনই অবাক। এ তো ফল নয়, দু পাটি জুতো। মনে হচ্ছে সদ্য কেনা এক জোড়া জুতো। নাবিন বলল, 'পরে দেখো তো বাবা। তোমার পায়ে হয় কি না?'

বাবা পরে দেখলেন। উঁহুঁ। অনেক বড়ো। সঙ্গে সঙ্গে ছাদে উঠলেন বাবা। আরো কয়েক জোড়া জুতো ধরে আছে গাছে। জোড়ায় জোড়ায়। এমন অবাক কাণ্ড দেখে তিন জোড়া চোখও কপালে উঠল। বাবা-মা আর নাবিনের। মাঝারি আকারের এক জোড়া জুতো পাড়লেন বাবা গাছ থেকে। আর পা গলিয়ে দেখলেন, বাহ! কী সুন্দর পায়ে এঁটে গিয়েছে।

তারপর ছোট্ট এক জোড়া জুতো ফল পাড়লেন। নাবিনের মাপে হয়ে গেল! আরো এক জোড়া পাড়লেন। সেটাও মায়ের পায়ের মাপে হয়ে গেল। কী সুন্দর! নাবিনদের একটা জুতো গাছ হয়ে গেল। উঁহুঁ। একটা নয়। এক জোড়া জুতো গাছ। ভাগ্যিস জুতো গাছের কথা এখনো কেউ জানে না।

কিন্তু অবাক বিষয় জুতো জোড়া কার ছিল?

নাবিন এখন মানুষের পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখ জোড়া খুঁজে বেড়ায় বিশাল আকারের এক জোড়া পা। সকাল-দুপুর-বিকেল। এমনকি রাতেও। যদি কোনোদিন জুতো জোড়ার মালিককে পেয়ে যায়!

দ্বীপাঞ্জলি বড়ুয়া তন্নি, তৃতীয় শ্রেণি, এসএই, বিএফএ

গোয়েন্দা গল্প

গন্ধ শুঁকে টাকার তোড়া

অরুণ কুমার বিশ্বাস

ঘটনা এবার সেই কুসুমপুরে। না না, খুনখারাবি তেমন কিছু নয়। তবে ভয়ংকর এক চুরির ঘটনা পুরো গ্রামটাকে বলতে গেলে কাঁপিয়ে দিলো। গোয়েন্দা গুবলুর গ্রামে টাকা চুরির কেস। দুটো নয়, চারটে নয়, একেবারে চার লাখ!

টাকাটা চুরি গেছে আবার সেই নাবিলের দাদুর দেরাজ থেকে। তোমরা দেরাজ চেনো তো, দেরাজ? শহুরে বাবুরা যাকে বলে ড্রয়ার। নাবিলের দাদুর বয়স একশর কম নয়। অথচ এখনো তিনি সকালবেলা উঠে নিয়ম করে হাঁটেন। তার হাতে থাকে হাতির দাঁতে বাঁধানো হাতলঅলা একখানা লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে তিনি বিড়াল-কুকুর থেকে শুরু করে চোর-বাটপাড়, দুষ্টু লোক, সব্বাইকে ঠকাস করে মারেন। তিনি যেহেতু এই গাঁয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ, তাই টুকটাক পিটুনি দেওয়াটা নাকি তার অধিকারের মধ্যে পড়ে।

ইদানীং নাবিলের দাদু আমীর আলীর শরীরটা খুব ভালো যাচ্ছিল না। প্রায়ই শরীর খারাপ হয়, ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠতে পারেন না, তাতে তার সকালবেলার হাঁটাটা বাদ পড়ে যায়। সে যাক, তাতে কোনো অসুবিধে নেই। মানুষ জন্মালে মারা যাবে, শিশু থেকে বুড়ো হবে- এটাই তো রীতি। কিন্তু তাই বলে কুসুমপুরে চুরি! যেখানে কিনা গুবলুর মতো একজন দুঁদে গোয়েন্দার বসবাস! না না, ব্যাপারটা কেউ মানতে পারে না। কিছুতেই না।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। হঠাৎ খেলার মাঠে খবর নিয়ে ছুটল একজন, ওপাড়ার পল্টু। সে জানালো যে, নাবিলের দাদুর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। আমীর আলীর অবস্থা সত্যি খুব খারাপ। যাকে বলে গুরুতর। তিনি আছেন কী নেই, সেকথা কেউ বলতে পারে না। আমীর আলীর জবান বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি কাউকে ঠিক চিনতে পারছেন না। শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন।

খেলা ফেলে বাড়ির পথে ছুটল নাবিল। ওর দেখাদেখি বাকি বন্ধুরাও। রুদ্ধশ্বাসে ছুটছে সুমন, যাকে সবাই 'লম্বু সুমন' বলে ডাকে। কঞ্চি সুমনও বলে কেউ কেউ। হাঁটা আর দৌড়ের মাঝামাঝি কদমে ছুটছে বাপ্পি আর গোয়েন্দা গুবলু। তখনো সে অবশ্য জানে না, নাবিলদের বাড়িতে গুবলুর জন্য এক বিশাল রহস্য অপেক্ষা করে আছে। বা বলা যায় ওর নাকের ডগায় লোভের মূলোর মতো করে রহস্য দুলছে।

তাই হবে বটে! নইলে হাঁটার সাথে সাথে গুবলুর নাকটা অমন সুড়সুড় করছে কেন! তার মানে রহস্য আছে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না, একজন শতবর্ষী বুড়োর হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে রহস্যের কী সম্পর্ক থাকতে পারে!

নাবিলদের বাড়ি যেতে বেশ কয়েকটা সবজির পালান আর ফসলের মাঠ পেরোতে হয়। দু-চারটে প্রতিবেশীর ঘরও পড়ে। মালির বউ বলল, যাও যাও, বুড়োর হয়ে এসেছে প্রায়! গুবলু এই 'হয়ে আসা' ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে না। কী হয়ে এসেছে! কার?

ওরা দ্রুত পা চালায়। নাবিল ঝড়ের বেগে ছুটছে। দাদুকে সে অসম্ভব ভালোবাসে। যদিও ওর দাদুটা খুব কৃপণ। কুসুমপুরের সবাই তাকে 'কিপটে বুড়ো' বলে জানে। এই গাঁয়ে আমীর আলীর শুভাকাঙ্ক্ষী বলে খুব একটা কেউ নেই।

বাপ্পি বলল, ও মালির বউ হয়ে এসেছে মানেটা কী? খুলে কও।

প্রশ্নটা গুবলুই করতে চেয়েছে। কিন্তু ওর মনের কথা কেড়ে নিয়ে বাপ্পিই শেষে বলল। মালির বউ অবশ্য রহস্যটা ভাঙল না। শুধু একটু হাসল। এই হাসির মানে কী তাও জানে না গুবলু।

ওরা বুঝল যে মিছে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। ওই তো নাবিলদের বাড়ি। আরেকটু এগোলেই সকল রহস্য পরিষ্কার হয়ে যাবে।

ওরা গিয়ে দেখে নাবিলদের বাড়িতে মেলা লোকের ভিড়। ঘরের মধ্যে মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে আছেন নাবিলের দাদু আমীর আলী। গাঁয়ের হাতুরে ডাক্তার নগেন তার নাড়ি টিপছে। নগেন একটা মানুষ বটে। চাইলে একে নিয়েই একখানা ফুল নভেল লেখা যায়। গুবলু মাঝে মাঝে ভাবে, নগেন কী আগেভাগেই জেনে বসে থাকে নাকি যে, কার ঠ্যাং ভাঙবে, কার হার্টের ব্যামো, কার মাথা ফাটবে! নইলে সে সবার আগে রোগীর কাছে পৌঁছায় কীভাবে! আশ্চর্য ব্যাপার!

নগেন গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, আমীর চাচু মরেনি কো এখনো, তবে পরিস্থিতি সুবিধার নয়। বিশেষ গুরুতর।

নাবিলের মা জমিলা বলল, তাহলে কী করতে হবে নগেনদা?

এক্ষুণি তারে থানা শহরে নিয়া যাও। নইলে বাপরে আর ফিরা পাবা না। তার 'হার্টে' খুব জোর একখান চোট লাগছে। কপাল ভালো হলি পড়ে বেঁচে যাবে। নইলে এই যাত্রাই শেষ, বুঝলা ভাবি!

গুবলু খুব খেয়াল করে শুনলো, হাতুড়ে নগেন কিন্তু হার্ট বলতে পারে না, সে বলবে 'হার্ট'। হাতুড়ে কিনা।

হার্ট মানে কটেজ বা কুঁড়েঘর। আবার হার্টবাজারও হতে পারে। অন্য সময় হলে হেসে ফেলত গোয়েন্দা গুবলু। কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন, তাই সে কণ্ঠনালীতে আটকে থাকা হাসিটুকু পিরানহা মাছের মতো কপাত করে গিলে ফেলল।

মজার ব্যাপার, এই গাঁয়ের একজন বুড়ো মানুষ জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে রয়েছে, অথচ তাতে যেন কারো তেমন উদ্বেগ নেই। হাতুড়ে নগেনের কথামতো আমীর আলীকে থানা-শহরে নেওয়ার জন্য ভ্যান এসে গেল। তাতে বিছানাপত্তর-বালিশ তোলা হলো, যাতে নাবিলের দাদু শুয়ে শুয়ে আরাম করে শহরে যেতে পারেন। এসব যারা করছে, তাদের ঠোঁটে হাসির ফোয়ারা ছুটছে। যেন বিয়েবাড়ির মেরাপ বাঁধছে ওরা।

গুবলু ভেবে দেখল যে এর পেছনে কারণটা বড়ো অদ্ভুত। গাঁয়ের অনেকেই মনে করে, নাবিলের দাদু আমীর আলী মেলা দিন ধরে বেঁচে আছেন। এখন তার ছুটি নিলেই হয়। আর বুড়ো বয়সে মৃত্যুর ক্ষেত্রে হার্টের ব্যারামের মতো আরামের আর কিছু হয় না। কষ্ট নেই, ক্লেশ নেই, বৈশাখি ঝড়ে আম পড়ার মতো টুক করে অমনি মরে গেল।

কিন্তু নাবিলের চোখে কান্না। দাদুর সাথে তার কতশত স্মৃতি! দাদুও তাকে অনেক ভালোবাসেন। ও এমন একটা ভাব করছে, যেন আমীর আলী সত্যিই আর বেঁচে ফিরবেন না। যাচ্ছেন অসুস্থ রোগীর মতোন, ফিরবেন লাশ হয়ে।

নাবিলের বাপ-চাচারা তিন ভাই। ওর বাপ নুরুল হক

শুধু চাকুরে, বাকি দুজন এক্কেবারে যাচ্ছেতাই, খোদার খাসি যাকে বলে। না কিছু করে, না গতর খাটায়। বসে বসে শুধু খায় আর গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই নিয়ে আমীর আলী তার ছোটো দুই ছেলের উপর মহা খাপ্পা। খাসি তো ভালো, পারলে নাবিলের দাদু তার দুই ছেলেকে ইঁদুর-বিলাই বলে ডাকেন।

বাপ অসুস্থ, তাতে চাচাদের যেন কোনো চিন্তাই নেই। নাবিলের বড়োচাচা জলিল তাস খেলায় ওস্তাদ, আর ছোটোচাচা খলিল ক্যারাম ভালো খেলে। এই নিয়েই তারা মেতে আছে। সক্কালবেলা একপেট খেয়ে সেই যে পাড়ায় বেরিয়ে যায়, সারাদিনে আর তাদের মুখটি দেখা যায় না। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সেই বিকেল চারটে। খিদে পেলে তবেই তারা বাড়ি ফেরে। এমন উড়নচণ্ডী ছেলেদের কেই বা ভালোবাসে!

দাদুর ঘরে অন্যরা খুব একটা ভেড়ে না, নাবিলই যা একটু তার খোঁজখবর করে। এর পেছনেও কারণ আছে। ওর দাদু আমীর আলী নিজেই বারণ করে দিয়েছেন। 'খবরদার! আমার খবর নিতে তোমরা কেউ এ-ঘরে আসবে না! কেন তোমরা আমার ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করো, বুঝি না ভেবেছ! ওই কটা টাকা তো! কেউ পাবে না, কেউ না। আমার টাকা চুরি করলে সে ধনেপ্রাণে মারা পড়বে। এই আমি অভিশাপ দিলুম'।

এমন কঠিন কথা বলার পর কেউ কী আর সাহস করে তার ঘরে ঢুকবে! নাবিলের মা জমিলাই শুধু ওর দাদুর ঘরে ঢুকতে পারে। আমীর আলী জানেন, জমিলার মনে কোনো লোভ নেই। টাকাকড়ি তার কাছে স্রেফ নস্যি। টাকায় কী হয়! টাকা দিয়ে কি সুখ হয়, না জীবন বাঁচে!

তারমানে দাদুর ঘরে মেলা টাকা আছে। ক্যাশ টাকা। তিনি পুরোনো দিনের মানুষ। ব্যাংকের উপর তার বিশ্বাস নেই। তাছাড়া ব্যাংক থেকেও তো টাকা লোপাট হয় আজকাল। রক্ষক নিজেই এখন ভক্ষক।

টাকা যে আছে এই খবরটা আর কে কে জানে, ওর জানা নেই। দাদুর ঘরে দুটো আলমারি, কিন্তু একটাই মাত্র দেরাজ। টাকা থাকলে সেখানেই থাকবে। তালাচাবি দেওয়া।

এই মুহূর্তে টাকা-ফাকার কথা কেউ ভাবছে না। সবাই ভাবছে ওর দাদুর কথা, আমীর সাহেবকে কীভাবে সুস্থ করা যাবে তাই নিয়ে সলাপরামর্শ চলছে। ভ্যান এসে গেছে। বিছানা-বালিশ পাতা শেষ। এবার প্রায়-মৃত আমীর আলীকে ভ্যানে তোলা হবে।

কিন্তু বুড়ো লোকটার সঙ্গে কে যাবে! অফিস খোলা তাই নাবিলের বাবা নুরুল হক বাড়িতে নেই। তার আসার জন্য অপেক্ষা করলে বুড়োকে বাঁচানো যাবে না। কিন্তু তার ছোটো দুই ছেলে জলিল আর খলিল বেঁকে বসল। তারা কেউ যাবে না বাপের সঙ্গে। কেমন ছেলে বোঝো!

কেন যাবে না, শুনি? পাড়ার মুরুব্বি গোছের একজন বললেন।

জলিল জানালো যে, হাসপাতালের গন্ধ তার ভালো লাগে না। বড্ড গা গোলায়। আর খলিলের এক কথা, বাপ তারে দেখতে পারে না। তাই সঙ্গে গেলে জেগে উঠে তাকে দেখলে তাতে হিতে বিপরীত হবে। বাপ হয়ত রেগে যাবে আরো। তাই সে যাবে না।

খোঁড়া যুক্তি, সন্দেহ নেই। নাবিল বলল, তাহলে আমি যাই দাদুর সঙ্গে?

সাধু সাধু! এই না হলে নাতি! সবাই ধন্যি ধন্যি করতে লাগল। কিন্তু নাবিল একা গিয়ে কী করবে! ও তো এখনো বলতে গেলে ছেলেমানুষ। ওর কথায় কি আর ডাক্তার রোগী দেখবেন! না না, সাথে কাউকে যেতে হবে।

কিন্তু আগবাড়িয়ে কেউ যেতে চাইল না। নিজের ছেলেরা যেখানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সেখানে গাঁয়ের লোকের কী ঠেকা পড়েছে যে বুড়োকে নিয়ে নিজ গরজে হাসপাতালে যাবে। তাছাড়া সেখানে মেলা টাকাকড়িরও প্রশ্ন আছে। এই দায় কে নেবে!

দুই.

হাসপাতালে কে যাবে আর কে যাবে না, এই নিয়ে যখন দড়ি টানাটানি চরমে, ঠিক তখনই ওদের সব্বাইকে চমকে দিয়ে উঠে বসলেন নাবিলের দাদু আমীর আলী।

অমনি সবাই ভূত দেখার মতোন চমকে উঠল। প্রায় যায় যায় বুড়োটা আবার নিজে থেকে উঠে বসল কীভাবে! বিস্ময়কর ব্যাপার!

শুধু উঠে বসলেন তাই নয়, আমীর আলী চোর পালানোর মতো করে ঘরের দিকে ছুটলেন। তখন

তাকে দেখে কে বলবে যে তার বয়স একশ ছাড়িয়েছে! কিন্তু কই ছুটলেন আমীর আলী! কেন?

বাকি সব তার পিছু নিল। পুরো গ্রাম ভেঙে পড়ল তার ঘরে। সবার এক কথা, দাদু যায় কই দেখি একবার।

আমীর আলী নিজের ঘরে ঢুকেই দিলেন এক চিলচিৎকার। গেল গেল, গেল রে, আমার জমানো টাকাকড়ি সব কে নিয়ে গেল!

কী হয়েছে দাদু? কে কী নিয়ে গেছে? নাবিল ছুটে গিয়ে বলল।

টাকা! আমার জমানো সব টাকা উধাও! চার লাখ টাকা। কোনোমতে বললেন আমীর আলী। তারপর আবার সেই মূর্ছা, জ্ঞান হারালেন তিনি। বিষাক্ত শুঁটকি খেয়ে ইঁদুর যেমন আড়াইপাক দিয়ে মরে, ঠিক তেমনি জায়গায় ব্রেক কষলেন দাদু।

নাড়ি টিপে হাতুড়ে নগেন বলল, না না, ভয়ের কিছু নেই। চোখেমুখে পানি ছিটান মা জননী। তাইলেই চাচার হুঁশ ফিরা আইব। টাকার শোকে তিনি পাথর হইয়া গেছেন।

নাবিলেরও তাই মত। দাদু যা কৃপণ! টাকার শোকেই না জানি তিনি হার্ট অ্যাটাক করেছিলেন কিনা!

নগেনের কথামতো পানি ছিটাতেই জ্ঞান ফিরল দাদুর। ততক্ষণে নাবিলের বাবা নুরুল হকও ফিরে এসেছেন। পথেই তিনি তার বাপের ব্যামোর কথা শুনেছিলেন। তাই জোরকদমে হেঁটে এসেছেন। তার সারা গায়ে জবজবে ঘাম। বুড়ো হোক, রোগা হোক, বাপ বেঁচে আছেন, তাতেই তিনি খুশি। বাপের ভালোবাসা সবার ভাগ্যে জোটে না। আমীর আলী মানুষ ভালো, তবে একটু কিপটে, এই যা!

একটু না, অনেকখানি কিপটা তিনি। খিদে পাবে তাই তিনি খুব একটা গায়ে খাটতেও রাজি ছিলেন না। তারচেয়ে পড়ে পড়ে ঘুমানো ভালো। ঘরের খাবার ঘরেই রইল।

দাদু অসুস্থ– এটা কোনো ব্যাপার না। নাবিলদের বাড়িতে এখন একটাই খবর, টাকা চুরি গেছে। চার লাখ। কে নিয়েছে টাকা! কে নিতে পারে! তাই নিয়ে ব্যাপক মাথা খাটাচ্ছে গোয়েন্দা গুবলু ও তার চেলাবাহিনি।

নাবিলের মনে হলো দেরাজ খুলে টাকা দেখতে না পেয়েই বোধ হয় দাদু হার্ট অ্যাটাক করেছেন!

গুবলু বলল, উঁহু! তা নয় নাবিল। তাহলে চোরের আঙুলের ছাপ থাকত চাবিতে। চোর এত বড়ো রিস্ক নেবে না। কখনোই না।

হুঁ! গুবলুর সাথে একমত হয় সুমন আর বাপ্পি। ওরা দুজন মাথা নাড়ল।

ওরা সমস্বরে বলল, চোর বাইরের কেউ নয় নাবিল। তোদের ঘরেরই কেউ হবে। শুনতে খারাপ শোনালেও এটাই সত্যি দোস্ত। সত্যিটা মেনে নে।

নাবিল কিছু বলল না। বলবে কী করে! সে তার পরিবারের সবাইকে চেনে। ঘর তো নয়, যেন একটা চোরের আড্ডাখানা! কাকে রেখে কাকে সে সন্দেহ করবে! তার দুটো চাচাই 'চোর চোর' স্বভাবের। আরো আছে কাজের মাসি রজনী বা বুধে। গরিব হলেই সে চোর হবে, এমন নয় অবশ্য।

সুমন বলল, শোন নাবিল, কথায় বলে, অভাবে স্বভাব নষ্ট। টাকার টানাটানি থাকলে লোভ হতেই পারে। কিন্তু দেরাজ তো তালাবদ্ধ ছিল।

বাপ্পিরও তাই মত। মন চাইলেও রজনী টাকা চুরি করবে কীভাবে! তাছাড়া ওর তত সাহস হবে না। রজনীর নামে অতীতে এমন অভিযোগও নেই। ওর পাস্ট রেকর্ড ভালো।

টাকার চিন্তায় নাবিলের দাদু আধা ঘণ্টার মধ্যেই দিব্যি সুস্থ হয়ে গেলেন। তিনি কাজের লোক বুধেকে দিয়ে থানায় খবর পাঠালেন। বলে দিলেন, যেমন করেই হোক বুধে, পুলিশ বাবুকে সঙ্গে করেই আনবি। ওসি সাবকে না পেলে মেজো দারোগা, কিন্তু তার নিচে নয়। তাইলে গাঁয়ের লোক সমীহ করবে না। পদের একটা দাম আছে না! বিলাই দিয়া কি আর হালচাষ হয়? হয় না। তাই ওসি সাব বা মেজো দারোগা চাই।

পুলিশ আসছে শুনে ভিড় আরো বাড়ল। পাবলিক এমন যে, পিঁপড়ার মতো গুড়ের গন্ধ পেলেই অমনি জেঁকে বসে। হুজুগে বাঙালি যাকে বলে।

পুলিশ আসছে আসুক, নাবিল কিন্তু কেসটা গুবলুকেই দিলো। দাদুর টাকা কেউ মেরে খাবে, এটা সে কিছুতেই হতে দেবে না। কাভি নেহি।

গুবলু গোয়েন্দা যথারীতি তদন্ত শুরু করল। সহযোগী দুজন- সুমন আর বাপ্পি। নাবিলও তার দলে, কিন্তু

এক্ষেত্রে সে বাদী। অর্থাৎ গুবলু গোয়েন্দার ক্লায়েন্ট বা মক্কেল।

প্রথম প্রশ্ন- টাকাটা কখন চুরি গেল! নাবিলের দাদু অসুস্থ হবার পরে নাকি আগে! এমন হতে পারে, দাদু আমীর আলী কাঠের দেরাজ খুলে টাকাটা জায়গামতো না পেয়ে হার্ট অ্যাটাক করেছেন। আবার এমন হওয়া বিচিত্র নয়, দাদু দেরাজ খুললেন, টাকা দেখলেন, গুনলেন, তারপর মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন। সবাই যখন তাকে নিয়ে টানাটানি করছে, বা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে এল, সেই ডামাডোলের সুযোগে চোর ব্যাটা টাকাটা হাতিয়ে নিয়ে হাওয়া।

হ্যাঁ, দুটোই হতে পারে গুবলু। কঞ্চি সুমন অমনি ঢপ করে মাথা নেড়ে বলল। ও আসলে অন্যের কথায় তাল দিতে ওস্তাদ। বাপ্পি যদি এখন এর উলটোটা বলে, সুমন তাতেও তাল ঠুকবে। অদ্ভুত ছেলে এই কঞ্চি সুমন। জাত বিচারে একটু নরমসরম, তবে কাজের বেলায় কখনো কখনো দুর্দান্ত।

গুবলুর কথাটা নাবিলের বেশ মনে ধরল। ওর দাদু যা মানুষ, তাতে চার লাখ টাকা খোয়া গেলে তার হার্ট লাফানো বন্ধ হতেই পারে। মানে নো হার্টবিট।

তাই হবে রে নাবিল। বাপ্পি বলল। নইলে তোর দাদু জ্ঞান ফিরে পেয়েই অমনি তার নিজের ঘরে ছুটবেন কেন! মোট কথা, টাকার লোভেই তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। তারমানে টাকা ভালো। টাকা মরা বাঁচায়। ওরা তিনজন মুচকি হাসল। বেশি শব্দ করে হাসা বারণ। কারণ পুলিশ আসছে। বুধে পুলিশ আনতে গেছে। ওসি সাব নয়তো মেজো দারোগা। পরিস্থিতি ক্রমশ আরো ঘোলাটে হচ্ছে।

তিন.

নাবিলের দাদু আমীর আলী তার নিজের ঘরেই সটান শুয়ে আছেন। জ্ঞান ফিরলেও তার শরীর দুর্বল। একটা বয়সের পরে বাস্তবে মানুষের আর বয়স বাড়ে না। আমীর আলী সেই দলে পড়েছেন। তিনি একশ উতরেছেন।

হাতুড়ে নগেন বলল, খুব সাবধান! দাদুর মনে যেন নতুন করে কোনো চোট না লাগে। তবে তার টাকাটা উদ্ধার করতে পারলে ভালো হয়। টাকা শুঁকলে তিনি মনে বল পাবেন।

পরের কথাটুকু নগেন মজা করে বলল, নাকি সত্যি সত্যি আমীর আলীকে এখন টাকা শোঁকানো দরকার! ওরা ঠিক ধরতে পারল না। আদতে বড়ো মানুষেরা এমন অনেক কিছুই বলে, গুবলুরা যা বুঝতে পারে না। ওরা তো সবে কিশোর। দিন-দুনিয়ার রকমসকম ওরা বুঝবে কী করে!

সে যা হোক, নাবিল মনেপ্রাণে চাইছে ওর দাদুর টাকাটা উদ্ধার হউক। ওর অনুমান, যেই টাকাটা চুরি করুক না কেন, ওটা এখনো দূরে কোথাও চালান করতে পারেনি। কাছেপিঠে কোথাও আছে।

কী করে বুঝলি নাবিল যে টাকাটা কোথাও উড়ে পালায়নি? সুমন অমনি হুড়কো দেয়।

সুমন আন্দাজ করে বলেছে। সে অত যুক্তিবুদ্ধির ধার ধারে না। এর নাম কমনসেন্স। গুবলু অবশ্য সুমনের পক্ষে বলল, আমারও তাই মত। কারণ দাদুর টাকা বাইরের কেউ নেয়নি। নেবার আসলে কোনো সুযোগ নেই। আর সে আমাদের আশেপাশেই আছে। তাই টাকাটাও উড়ে পালায়নি। আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

এর উত্তরে নাবিল 'উ-হুম' করে প্যাঁচার মতো একরকম শব্দ করল। যেন হুতুমপ্যাঁচা ডিম পাড়ছে। ওর মন আসলে আশা-নিরাশার দোলাচলে দুলছে। দাদুর টাকাটা উদ্ধার হবে তো! নইলে দাদু গন! টাকার শোকেই অক্কা পাবে।

নিয়মমতো গুবলুবাহিনি চুরির স্পট মানে অকুস্থল দেখতে এল। আমীর আলীর ঘর, আঠারো বাই বারো ফুটের মতোন হবে। ঘরের ভিতরে আসবাব বলতে তেমন কিছু নেই। দুটো কাঠের আলমারি, চৌকি, আলনা, দুটো খাড়ুর মতোন জিনিস, আর আছে একটা ঠেস দেওয়া বেঞ্চি। ডানের আলমারির দেরাজে টাকাটা রাখা ছিল। আলমারিতে তালা নেই, তবে দেরাজে আছে। মেহগনি কাঠের আলমারি, বেশ শক্তপোক্ত। পাশেই খোলা জানালা, কিন্তু জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেরাজ খোলা সম্ভব নয়।

দেরাজখানা খোলা পড়ে আছে অবশ্য। ভাবখানা এমন, যেন পাখিই নেই তো খাঁচার দরজা আটকে রেখে কী লাভ!

গুবলু গোয়েন্দা দেরাজখানা টেনেটুনে দেখল। চাবিটাও নিচে পড়ে আছে। কিন্তু ওটা সে নিজের হাতে তুলল

না, চোরের আঙুলের ছাপ থাকতে পারে। মেঝেতে প্রচুর পায়ের ছাপ, যেন কাটাকুটি খেলছে। পায়ের ছাপ দিয়ে চোর ধরা যাবে না। কারণ ওর দাদুর যখন হার্ট অ্যাটাক হয়, অনেকেই তখন এই ঘরে ঢুকেছিল, তাই মেলা পায়ের ছাপ থাকবে।

গুবলু কী যেন ভাবছে। নাকি কিছু শুঁকছে! দেরাজের কাছে গিয়ে নাকখানা বাড়িয়ে দিয়ে শুশুকের মতো শুঁক শুঁক শব্দ করল। গুবলু কী শুঁকছে কে জানে!

নাকটা বেশি গলায় বলেই বন্ধুমহলে গুবলুর আরেক নাম 'নাকু গুবলু'। ওর নাকটা কিঞ্চিত বেশি লম্বা, তাই যে-কোনো স্মেল সবার আগেই সে পেয়ে যায়। 'নোজি বয়' যাকে বলে।

রেগেমেগে নাবিল শেষে বলেই ফেলল, কী রে গুবলু, ছুঁচোর মতোন অমন ছোঁক ছোঁক করছিস কেন? টাকার গন্ধ পেয়েছিস বুঝি!

দেরাজের চাবিটা সে হাতে নেয়নি বটে, তবে মেঝেতে পড়ে থাকা চাবিটা গুবলু খুব খেয়াল করে দেখল।

তারপর মনে মনে সে সন্দেহের তালিকাটা বানালো।

সাসপেক্ট লিস্টে সবার উপরে নাম নাবিলের দুই চাচার জলিল আর খলিল। দাদুর ভাষায় ওরা দুজন খোদার খাসি, আল্লাহর ষাঁড় যাকে বলে।

তারপর নাম উঠল কাজের মাসি রজনীর। তার টাকার দরকার থাক কি না থাক, কড়েকড়ে টাকার গন্ধ পেলে চুরির লোভটা জেগে উঠতেই পারে।

টাকা তো! বড্ড দরকারি জিনিস। যার আছে সেও টাকা চায়, আর যার নেই সে তো চাইবেই। সুমন বলল।

কাজের ছেলে বুধে! তাকে কি লিস্টে রাখবে না গুবলু!

নাবিল বলল, ওকে বরং তুই ছেড়ে দে গুবলু। বুধে চরম বোকামানুষ। টাকার দাম সে বোঝেই না। নিজের মাইনে-কড়িও সে ঠিকঠাক গুনে নেয় না। বাবা যা দেয় তাতেই সে খুশি।

হুম। বুঝলাম। গুবলু বলল। ওর হাতে কলম, মগজে ঘুরছে সম্ভাব্য চোরদের নাম। নাবিলের মা? জমিলার নাম কি সে লিস্ট থেকে বাদ দেবে! বাস্তবে চুরির সুযোগ কিন্তু তারই সবচেয়ে বেশি ছিল। সে-ই নাকি আমীর আলীর ঘরে প্রথমে ঢুকেছে। টাকাটা টুক করে তুলে নিয়ে শাড়ির আঁচলের তলায় লুকোলে কার কী করার আছে।

বুদ্ধিমান ছেলে নাবিল। ও বুঝতে পারে গুবলু ঠিক কী ভাবছে। মিহি গলায় বলল, মায়ের কথা ভাবছিস তো? নে গুবলু, লিস্টে আমার মায়ের নামটাও লিখে ফেল। চুরির সুযোগ তারও কিছু কম ছিল না।

তাতে লজ্জা পায় গোয়েন্দা গুবলু। বলে, দেখ নাবিল, এই পথ বড়ো কঠিন রে! সত্য অন্বেষণ করতে গেলে আপন-পর বাছলে চলে না। মানুষের মন বড়ো আজব, কখন কী ভেবে বসে কে জানে!

নাবিলের বাবার নাম এই তালিকায় নেই। কারণ তিনি ঘটনার সময় বাড়িতেই ছিলেন না। এটা তার মস্ত অ্যালিবাই।

নাবিলের নামও নেই। কারণ সে তখন খেলার মাঠে ক্রিকেট বল হাতে গুগলি ছুঁড়ছে। আর ব্যাট হাতে ঠেকাচ্ছে সুমন।

ফলে নাবিলের দুই চাচা জলিল-খলিল, ওর মা জমিলা আর কাজের মাসি রজনীকে নিয়ে পিংপং বলের মতো মগজ ঘামাতে থাকে গোয়েন্দা গুবলু।

চোর এদের মাঝেই আছে। থাকতেই হবে। কিন্তু কে চোর! কে?

দাদুর খবর পেয়ে হোক বা বুধের ডাকে, বড়োসায়েব স্বয়ং এসে হাজির। রাত্তির তখন আটটার কিছু কম নয়। বড়োসাবকে দেখে আমীর আলী উঠে বসলেন। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

‘যেমন কইরেই হউক, টাকাটা আমার উদ্ধার করে দেবেন সাব। নইলে আমি ধনেপ্রাণে মইরে যামু।’

বুড়োর কথা শুনে বেশ মজা পেলেন ওসি হেকমত। শ’খানেক বছর পেরিয়ে এলেন, মড়ার দুয়ারে এক-পা ফেলেই আছেন, তারপরও নাকি তার টাকা চাই। হায়রে দুনিয়া! সব নেব কিনিয়া!

‘ওরে ও টাকা, তুই সময়মতো আইলি না’। ওসি সাহেব অমনি পুরোনো দিনের একটা ঢাকাইয়া ছবির গান গুনগুন করতে লাগলেন।

বুড়োর কান্নাকাটি দেখে মনটা খানিক নরম হয় ওসির। তিনি তাকে কথা দিলেন, যেমন করে হোক, চোর তিনি ধরবেনই। আর একবার ধরতে পারলে তাকে হিড়হিড় করে থানায় নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবেন!

তাতে আশ্বস্ত হন আমীর আলী। পুলিশের উপর তার অগাধ বিশ্বাস। তার মতে পুলিশ খালি মড়া বাঁচাতে পারে না, চাইলে বাকি সব পারে।

গুবলুর উপর কারো ভরসা নেই দেখে পুরো গোয়েন্দা টিম মনে কষ্ট পায়। পুলিশ সব পারে, আর গুবলু কিছু পারে না! কেন, সেবার মামাবাড়ি গিয়ে জেলা শহরের সেই আদম বেপারির কেসটা কি সে সল্‌ভ করেনি!

নাবিল অবশ্য বলল, দেখ গুবলু আমি জানি, পুলিশ নয়, তুইই চোর ধরতে পারবি।

ওসি সাহেবের সঙ্গে তার দুই চেলা এসেছে। কনস্টেবল হবে নিশ্চয়ই। যেমন সিড়িঙ্গেপানা দেখতে! দেখে মোটে পুলিশ বলে মনেই হয় না! মনে হয় যেন বিয়েবাড়ির বাজনদার। নেহাত তাদের পরনে উর্দিটা আছে, নইলে গাঁয়ের পোলাপান মোটেই সমীহ করত না।

এ বড়ো জটিল কেস! মানতে বাধ্য হয় গুবলু। কাজ শুরু করার মতো কোনো ক্লু বা সুতোই হাতে পাচ্ছে না।

কীরে সুমন, কিছু খুঁজে পেলি? বাপ্পি, তুই কী ভাবছিস? গুবলু চোখ নাচিয়ে বলল।

ওরা দুজন অল্প জলের ভ্যাদা মাছের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মানে নো আইডিয়া।

নাবিলের মা জমিলা? তিনিই প্রথম ওর দাদুর ঘরে ঢুকেছিলেন। সুযোগটা তার বেশি। কিন্তু গুবলু যদ্দুর জানে, আমীর আলীকে তিনি খুব সম্মান করতেন, ভালোও বাসতেন। তার দেখাশোনায় কোনো ত্রুটি রাখতেন না নাবিলের মা জমিলা।

ফেলুদা বলতেন, চোখে দেখলেই সব সময় তা সত্যি হয় না। দেখায়ও কখনো কখনো ভ্রম হয়।

উঁহু, নাবিলের মাকে কিছুতেই চোর ভাবতে পারছে না গুবলু। তিনি এ-কাজ করতেই পারেন না। তিনি তার শ্বশুরকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, চুরি করবেন কখন!

বাকি থাকল তিন- নাবিলের অপোগণ্ড দুই চাচা জলিল, খলিল আর কাজের মাসি রজনী।

সুযোগ বুঝে রজনীকে একটু জেরা করল গুবলু। আচ্ছা মাসি, দাদুর অসুস্থতার খবর তুমি কখন পেলে? কোথায় ছিলে তুমি?

রজনী চালাক-চতুর দেখতে। সে সুন্দর গুছিয়ে বলল, আমি তখন পাঁকের ভিতর থন মানকচু তুলছিলাম। আমি কি জানি দাদুর অমন অইবো! জমিলা’বুর চিৎকার হুনি আমি কচু থুইয়া বাড়িত আইলাম।

হুম। গুবলু আর কোনো প্রশ্ন করেনি। ওর অনুমান, টাকাটা দাদু অসুস্থ হবার মিনিট কয়েকের মধ্যে সরানো হয়েছে। কারণ তার খানিক পরে অনেক লোক এসে জড়ো হয়। তখন চাইলেও আর কারো পক্ষে আলমারির ভিতরের দেরাজ থেকে টাকা নেওয়া সম্ভব ছিল না।

রজনীর কথাটা ক্রসচেক করল গুবলু। নাবিলের মাকে গিয়ে বলল, চাচি, দাদুর যখন হার্ট অ্যাটাক হয়, রজনী তখন কই ছিল? বাড়িতে নাকি অন্য কোথাও?

বাড়িতে ছিল না। ও তখন মানকচু তুলতে ক্ষেতে গেছিল, জমিলা বললেন। নাবিলের মায়ের কথা তো আর ফেলা যায় না, চাচির কথা অস্বীকার করারও কোনো উপায় নেই। কেননা, কাজের মাসি রজনীকে বাঁচিয়ে তার কী লাভ! বরং কাজটা যদি তিনি নিজে করে থাকেন, সেক্ষেত্রে মেয়েটাকে ফাসালেই বরং তার লাভ বেশি।

গুবলু তাও শিওর হবার জন্য আরেকবার বলল, চাচি, মনে করে বলেন তো রজনী তখন কচু তুলতেই গেছিল নাকি দাদুর ঘরের আশেপাশে কোথাও ছিল?

নাবিলের মা ভাবতে থাকেন। তারমানে ভাবনার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু মিনিটখানেক ভেবেও জমিলা

চাচি নতুন কিছু খুঁজে পেলেন না। তিনি দেয়ালঘড়ির দোলকের মতো ঘাড় নেড়ে বললেন, না না, রজনী তখন বাড়িতেই ছিল না। সে ছিল ক্ষেতের আলে, মানকচু ঝাড়ের কাছে।

গোয়েন্দার চেলা কঞ্চি সুমন কানে কানে বলল, এই গুবলু, রজনীকে বরং ছেড়ে দে। টাকাটা সে চুরি করেনি, ঘরের মালকিন স্বয়ং বলছেন। মিছে কাজের মেয়ের পিছে পড়ে থেকে কোনো লাভ নেই। লিস্টে আরো তো দুজন আছে। তাছাড়া গরিব হলেই যে সে চোর হবে, তারও কোনো কারণ নেই। যারা ভদ্র তারা না খেয়ে মরবে, তাও অন্যের ঘরের জিনিসে হাত দেবে না। কখনো না।

মহা বিপাকে পড়ল গোয়েন্দা গুবলু। রজনীর ভাবসাব দেখে তার মনে হয়েছিল যে, এই মেয়ে চোর না হয়ে যায় না। তার চেহারায় চোর চোর ভাব রয়েছে। না না, চোর নয়, মহিলা চোরকে চুন্নি বলেও ডাকা যায়।

চার.

ওদিকে ওসি সাহেব কিন্তু মেলা জেরাফেরায় গেলেন না। তিনি অল্প চেষ্টায় কাজ উদ্ধার করতে চান। তিনি বড়োসড়ো একখানা হাঁক পেড়ে বললেন, টাকাটা কে নিয়েছ ভাই, বলে দাও। স্বেচ্ছায় অপরাধ কবুল করলে সাজার পরিমাণ কম। আমাকে বেশি খাটালে কিন্তু তার পরিণাম ভালো হবে না। জানো তো, নির্দয় নিষ্ঠুর অফিসার হিসেবে বাজারে আমার বেশ বদনাম আছে। আমি লোক মোটেও সুবিধার না, চোরছ্যাঁচড়ের দেখা পেলে আমি আরো খারাপ হয়ে যাই। নাচতে নাচতে রাগ আমার পায়ের পাতা থেকে ঘাড়ে চড়ে বসে। আর তখন আমি কী করি, আমি নিজেই জানি না।

বাহ! বেশ বলেছেন। মনে মনে ওসি সাহেবের কথার তারিফ করে গুবলু। নম্র-ভদ্র ভাষায় কত সুন্দর একখানা থ্রেট কষালেন তিনি। এই না হলে পুলিশ!

গুবলুর সন্দেহের তালিকা কমে এখন তিনে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে আছেন নাবিলের মা জমিলা চাচি, ওর দুই চাচা জলিল আর খলিল। না না, জমিলা চাচি এ-কাজ করবেন না। তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসাও করা যায় না। তিনি খুব অপমান বোধ করবেন।

কী রে সুমন, এবার কী করা যায় বল তো? হাতের মধ্যে তিন, করে ঘিনঘিন। তুই কী ভাবছিস, নাবিলের মা টাকাটা নিতে পারে?

উঁহু, তাকে বাদ দিয়ে এগোও গুবলু। গোয়েন্দা বলে যাকে-তাকে সন্দেহ করাটা অন্যায়। তাতে আর যাই হোক, সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না। কান চুলকে কঞ্চি সুমন বলল।

গুবলু সুমনের কথাটা মেনে নিল।

তাহলে বাকি থাকে আর দুজন, নাবিলের জলিল চাচা আর খলিল চাচা। গুবলুর ধারণা, তার গোয়েন্দগিরি সঠিক পথেই এগোচ্ছে। যদি না ভিড়ের মধ্যে মওকা বুঝে বাইরের কেউ টাকাটা তুলে নিয়ে পালায়।

ওর দাদুর কথামতো সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। কারণ অজানা-অচেনা কারো পক্ষে দুটো আলমারির একটার ভিতরের দেরাজ থেকে টাকা বের করা কঠিন। সে তো জানবেই না, টাকাটা কোথায় রাখা আছে।

ওসি সাহেবেরও তাই মত। চোর বাইরের কেউ নয়, ঘরোয়া লোকেই কাম সারছে। কিন্তু কথা হলো এই, সেই চোরটা আসলে কে! জলিল, নাকি খলিল?

দুই ভাই এখন জেরার মুখে আছে। গুবলুও টুকটাক কিছু প্রশ্ন করল। ছোটো ছেলে বলে ওসি সাহেব তাতে মোটেও মাইন্ড করেননি। তিনি ইতোমধ্যেই জেনেছেন, এই ছেলের মগজের জোর বেশ। জেলাশহরে গিয়েও সে তার বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় পেশ করে এসেছে। এমন ছেলেই তো চাই! যারা কিনা দেশকে ভালোবাসবে, ভবিষ্যতে এই দেশের নেতৃত্ব দেবে। কথা কম বলে কাজ বেশি করবে।

কিন্তু জলিল আর খলিল বহুত ধড়িবাজ মানুষ। ওরা ভাঙবে তাও মচকাবে না। নাবিলের দাদু আমীর আলী নিজে ছেলেদের চরিত্র সম্পর্কে সার্টিফিকেট দিলেন। তেতো গলায় বললেন, ওসি সাব, ওদের মোটেও বিশ্বাস করবেন না। ওরা দুইজন বাস্তু ঘুঘু। কাজেকামে নাই, টাকা দেখলে অজ্ঞান। টাকা ওরা নিয়েছে। যে-কোনো একজন, বা দুজন মিলে ভাগাভাগি করেও নিতে পারে।

তাতে ফোঁস করে ওঠে জলিল। খলিলও।

সুমন অবশ্য বাস্তুঘুঘু জিনিসটা ঠিক কী, তা জানে না। ঘুঘু সে অনেক দেখেছে। ঘুঘুর ডিমও ভেজে খেয়েছে। ঘুঘুর ডিম মার্বেলের চেয়ে সাইজে একটু বড়ো। সে গাঁয়ের ছেলে, ঘুঘু চিনবে না!

দাদুর কথাই ঠিক। খলিল আর জলিল ঘুঘুর চেয়ে ঘাগু মাল। পুলিশের ঝাড়ি খেয়েও কেউ অপরাধ স্বীকার করল না। শুরু থেকেই তারা না না করে যাচ্ছে।

ওসি সাহেব মহা মুসিবতে পড়লেন। তার চাকরি জীবনে এমন কঠিন কেস আর পাননি। ঘরের জিনিস ঘরের লোকে চুরি করেছে, অথচ কেউ স্বীকার যাচ্ছে না! দেখো দেখি, কী আজব কাণ্ড!

জলিল, এখনো টাইম আছে, সব খুলি ক'। আমার কাছে কথা লুকোসনে জইল্যা। ওসি সাব আবারো কড়া ধাতানি দিলেন। জলিলের দিকে তাকালেও কথাটা তিনি দুজনকেই বলেছেন। কিন্তু খলিল মনে করে যে সে সন্দেহের বাইরে। তা না হলে ওসি স্যার তার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতেন।

এই ফাঁকে গুবলু আর তার দুই চেলা সুমন ও বাপ্পি অকুস্থলে আরেকবার ঘুরে এল। সেই ঘরে কেবল নাবিলের দাদু আমীর আলী আছেন। তার চোখ আধবোজা, দেখে বোঝা কঠিন তিনি জেগে আছেন, নাকি ঘুমোচ্ছেন! একটু আগে বড়োসড়ো একখানা হার্টের দাবড়ানি সামলে এখন তার জেগে থাকার কথা নয়। অথচ তিনি উৎকর্ণ হয়ে আছেন, শিকারি কুকুরের মতো।

গুবলু ঘরে ঢুকতেই পুরোপুরি চোখ বুজিয়ে ফেললেন নাবিলের দাদু। আশ্চর্য তো! কেসটা কী!

কিন্তু গুবলু এখন দাদুকে নিয়ে ভাবছে না, সে ভাবছে চোরের কথা। কে চোর?

আলমারির কাছে গেল গুবলু। সঙ্গে আর কেউ নেই। তার চেলা সুমন আর বাপ্পি বাইরে উঠোনে জলিল আর খলিলের জেরা শুনছে। ওসি সাহেব তাদের হেব্বি ধাতাচ্ছেন।

খোলা দেরাজ, সেখানে টাকা নেই। কিন্তু গুবলু কিছু একটার গন্ধ পাচ্ছে। কেমন যেন, অন্যরকম।

শুঁক শুঁক করে সে বাতাস শুঁকছে! কীসের গন্ধ এটা!

দেরাজের ভিতর উঁকি দেয় গুবলু। টাকা নেই, শুধু ইনভেলাপটা খালি পড়ে আছে। গুবরে কাগজের পুরোনো খাম।

গুবলুর উচ্চতা ভালো, তাই তার নাকমুখ দেরাজের মধ্যে ঢুকে যায়। আরেকটু খাটো হলে ভিতরটা দেখা যেত না। বলতে গেলে গোটা রহস্যই থেকে যেত অজানা।

গুবলু উঁকি মেরে ভেতরটা দেখে। ওই তো, কী যেন একটা দেখা যায় দেরাজের ভিতর! সাদা সাদা, গোল গোল! ঘুঘুর ডিম নাকি। নাহ্ তারচেয়ে ছোটো দেখতে। কী তাহলে ওটা?

গুবলু ওর নাকটা আরো কিছুটা ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। কেমন যেন ঝাঁঝালো গন্ধ লাগে নাকে। লাগে না বলে 'নাকে ঝাপটা দেয়' বললে বরং ঠিক হয়। এত কড়া যে, গন্ধটা অনেকক্ষণ অব্দি ওর নাকে লেগে থাকে।

গুবলু চট করে উঠোনে চলে আসে। সে আর নাবিলের দাদুর দিকে ফিরে তাকায় না। বুড়ো চোখ বুজে আছে, নাকি দরজার পাল্লার মতো চোখ খোলা রেখে কড়িকাঠে টিকটিকি গুণছে, কে জানে!

দেরাজে টাকার খোঁজ না পাক, কিছু একটা হদিস কিন্তু সে পেয়েছে। কী সেটা! উঁহু! এখন নয়, গুবলু সময়ে সব বলবে। তার কাজ এখনো শেষ হয়নি। এবার তাকে চোর ধরতে হবে। গন্ধটা তাকে এ ব্যাপারে বেশ হেল্প করবে।

ওদিকে ওসি সাহেব এখনো চোর ধরতে পারেননি। জলিল আর খলিলকে ছেড়ে এবার তিনি বুধেকে নিয়ে পড়লেন। বেচারা বুধে! যত দোষ নন্দ ঘোষ। যেন রবি ঠাকুরের সেই 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার মতো- কেষ্ট বেটাই চোর!

বুধে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ে। না, সে টাকা নেয়নি। টাকার প্রতি তার কোনো লোভ নেই। টাকা তো স্রেফ ছাপানো কাগজ। টাকা খেলে কী পেট ভরে! নাকি টাকা দিয়ে লজ্জা নিবারণ করা যায়!

তাই তো! বুধের বোধবুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সে মহাপুরুষ। এমন সহজসরল মানুষ লাখে একটা মেলে কিনা সন্দেহ।

গুবলু নাবিলের চাচা জলিল আর খলিলের আশপাশ ঘুরে এল। কী জানি কী হয়েছে ওর, গুবলু প্রথমে জলিলের পিঠে পিঠ ঘষল, তারপর খলিলের বুকে বুক ঠেকালো। ব্যাটা পাগল নাকি! চেলা সুমন আর বাপ্পি কিচ্ছু বোঝে না। গুবলুর কাণ্ড দেখে ওরা তাকিয়ে থাকে।

গুবলু আদতে মহা মুসিবতে ফেঁসে গেছে। ওর অনুমান ভুল। ও যা ভেবেছে বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। তবে কি সে টাকা চোর ধরতে পারবে না! নাবিলের চাচারা কেউ দোষী নয়! তারা লোক খারাপ হতে পারে, তবে বাপের টাকা তারা সরায়নি।

কিন্তু এত সহজে রণে ভঙ্গ দিলে তো হবে না। চোর তাকে ধরতেই হবে। নইলে নাবিলের দাদু আমীর আলী পুরো চোখ আর খুলতে পারবেন না, তার হার্টের ব্যামোও ঠিক হবে না। তিনি যে টাকা অন্ত প্রাণ, হাড়কেপ্পন যাকে বলে। টাকার গন্ধ না শুঁকলে তার চলবে কেন!

আরো কিছুক্ষণ এদিক সেদিক করে ওসিসাহেব অবশেষে হাল ছাড়লেন। নাহ, এ যাত্রা তার টাকা চোর ধরা আর হলো না। কাজের ছেলে বুধে টাকা নেয়নি বলেই তার অনুমান। সে বোকা বেবুঝ মানুষ, টাকার মূল্য সে বুঝবে না।

গুবলু কিন্তু বুধেকেও আরেকবার খরচোখে দেখে নিল। এমনভাবে তাকালো যেন সে পাকাচোর দেখছে। চোর তো চোরই, কাঁচা আর পাকা কী!

আছে রে বন্ধু, আছে। পাকাচোর দেখতে অন্যরকম হয়। যাকে বলে মিচকে চোরা, এরা সহজে ধরা দেয় না। মিটিমিটি হেসে গুবলু বলল।

ওসি সাহেব স্বেচ্ছায় হাত গুটিয়ে নিয়েছে দেখে দর্শক-শ্রোতা যারা ছিল, তারা খুব হতাশ হয়। কেউ কেউ পুলিশের নামে দুয়ো দিতে শুরু করে। না না, পুলিশ কোনো কম্মের নয়। মামুলি টাকা চোর ধরতে পারল না! পাবলিক এমনই। কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলে পাজি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গুবলু চোর ধরে ফেলল। কিন্তু টাকা! টাকার কী হলো! চোরের হাতে তো টাকা নেই! চোর সবার সামনেই ভালোমানুষের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু টাকা কোথায় গেল!

আবার বিপাকে পড়ে গুবলু। টাকা না পেলে শুধু চোর ধরলে তো হবে না। তাতে নাবিলের দাদুর মান ভাঙবে না। টাকাসুদ্ধ ধরতে পারলে তবেই না সবাই খুশি হবে। ঘোমটা ছাড়া বউ কেউ পছন্দ করে নাকি!

গুবলুর মগজ ঘামতে থাকে। চোর চোর চোর! চোর যেহেতু এখানে, টাকাও কাছেপিঠে কোথাও থাকবে। চোর টাকা নিয়ে বেশি দূর রাখতে পারেনি। সে জানে, তাহলে সে ধরা খাবে।

চরকির মতোন ঘুরতে থাকে গুবলু। সুমন বা বাপ্পি তার কেসটা ঠিক ধরতে পারে না। এমন কি নাবিলও না।

নাবিলদের বাড়ির উঠোনের চারদিকে পাক খেতে খেতে কিছু একটা চোখে পড়ে গুবলুর।

আরে, তাই তো! বরই গাছের ডালে ওটা কী!

গুবলু হন্তদন্ত হয়ে সেদিকে ছুটতে থাকে। ওর চোখের নজর খুব ভালো। নিয়মিত কচুর শাক, মিষ্টি কুমড়ো খায় কিনা। শহরে বাবুরা জানেই না কী খেলে শরীর ও চোখের নজর ভালো থাকে। খালি মাংস আর পিৎজা খেলে হবে! তরতাজা সবুজ শাকসবজিও খেতে হবে।

স্কুইরেল মাঙ্কি মানে কাঠবিড়ালির মতো তরতর করে বরই গাছের ডালে উঠে যায় গুবলু। গাছ বাইতে গুবলুর জুড়ি নেই। এই কাজে সে বানরকেও হার মানায়।

সুমনরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। ওসি সাহেব অবশ্য তখন কনস্টবেলদের নিয়ে থানায় যাবার উপক্রম করছেন। চোর যখন এখানে নেই, তিনি মিছে বসে থাকবেন কেন! থানায় মেলা কাজ পড়ে আছে, তাকে এখনই যেতে হবে।

কিন্তু গুবলু ইশারায় বলল, স্যার, একটু দাঁড়ান। কাজ হয়ে এসেছে প্রায়।

হয়ে এসেছে মানে? কী বলছ তুমি হে ছোকরা! ওসি সাহেব গাঁকগাঁক স্বরে চেঁচালেন।

চোর! চোর ধরছি স্যার। গুবলু গাছ বাইতে বাইতে বলল।

নাবিলদের উঠোনে বেশ পুরনো একটা বরই গাছ। ডালও বেশ শক্ত। নইলে গুবলু এত সহজে গাছ বাইতে পারত না। গাছের ডালে আছে একটা ইঁদুর মারার কল, মানে কাঠের বাক্স। ইঁদুর যাতে গাছের বরই খেয়ে না ফেলে, তাই এই ফাঁদ পাতা।

নিচের থেকেই গুবলু নজর করে দেখল, বাক্সের তলা থেকে সাদা সাদা কিছু একটা উঁকি মারছে! কী উঁকি মারছে? কী?

আরে, সেটাই তো দেখবে বলে গুবলু বরই গাছে

উঠেছে। চোখের পলকে সে বরই গাছ থেকে বাক্সখানা পেড়ে আনল।

ওর অনুমান একটুও ভুল নয়। সেই ইঁদুর মারার বাক্স বা কলের ভেতরেই লুকোনো আছে টাকা চুরির আসল কলকব্জা।

বাক্সখানা ধরে ঝাঁকুনি দিতেই বেরিয়ে এল ইঁদুরের বদলে কড়কড়ে নোট, নাবিলের দাদুর দেরাজ থেকে চুরি যাওয়া সেই চার লাখ টাকা।

কী করে জানলে গুবলু যে টাকাটা ওখানে আছে! অবাক হন নাবিলের বাবা নুরুল হক। নাকি তুমিই ওটা সরিয়েছিলে? হাসতে হাসতে বললেন তিনি।

তাতে নাবিল খুব রেগে যায়, লজ্জাও পায়। সে তেঁতুল গলায় বলল, না বাবা না, ও নেয়নি। গুবলু কী করে টাকা সরাবে! ও তো আমাদের সঙ্গে মাঠে খেলছিল।

নুরুল হক পরে অবশ্য বললেন, আমি তো জাস্ট জোক্স করছিলাম। তোমরা কি ঠাট্টাও বোঝো না!

হুম! এক রকম শব্দ করলেন ওসি সাহেব। টাকা উদ্ধার হলো, সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু ছোকরা হে, চোরটা কে?

ওসি আসলে গুবলুকে পুরো ক্রেডিট দিতে চান না। কারণ তিনি নিজে তা পারেননি। ভাবখানা এমন, যেন টাকা পেয়েছে, এ আর এমন কী! চোর ধরতে না পারলে...!

চোরও ধরেছি স্যার। আর একটু সবুর করুন। বেশ ভাব নিয়ে গোয়েন্দা গুবলু বলল।

উপস্থিত জনতা ওর কাণ্ড দেখে উসখুস করে। ছেলেটা দেখছি সত্যিই খুব চৌকস। বুদ্ধিমান বটে। নইলে ওসি সাহেব যা পারেননি, সে-ই তা করে দেখালো!

চোর কে, তাই বলো! ওসি সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। তিনি বুঝতে পারছেন, গ্রামবাসী সব তার দলে। গুবলুর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ।

গুবলু ছুটে গিয়ে কাজের ছেলে বুধেকে ধরে নিয়ে এল। ওসি সাহেবের কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, দেখুন তো স্যার, এর পকেট থেকে কিছু একটা গন্ধ পান কিনা!

ওসি সাহেব গুবলুর কথামতো বুধের জামার পকেটে নাক ডুবিয়ে দিলেন।

উঁহ্হু! কী বিশ্রী গন্ধ! জবজবে ঘামে ভেজা, তাতে আবার কীসের যেন বোঁটকা গন্ধ!

একটু ভালো করে শুঁকুন স্যার। এই গন্ধ শুঁকেই তো আমি চোর ধরেছি। গুবলু কলার নাড়ার ঢঙে বলল।

ওসি সাহেব আবারও বুধের পকেটে নাক ডোবান। ইয়েস, সামথিং ইজ স্ট্রেঞ্জ দেয়ার। কীসের গন্ধ? ন্যাপথলিন।

গন্ধ পেলেন তো! এবার চলুন স্যার অকুস্থলে যাই, মানে নাবিলের দাদুর ঘরে। গুবলু হনহন করে ঘরের দিকে হাঁটা ধরল। ওসি সাহেব ওর পিছু নিলেন। কারণ আজ গুবলুই হিরো, বাকি সব বিগ জিরো।

এই দেখুন ওসি স্যার, দেরাজের ভিতর কী রাখা আছে! আমি প্রথমে ভেবেছি ঘুঘুর ডিম, পরে বুঝলাম এর নাম ন্যাপথলিন। দাদু খুব চালাক। টাকা যাতে পোকামাকড়ে না খায়, তাই তিনি টাকার সাথে ন্যাপথলিন রেখে দিয়েছিলেন। সেই গন্ধ শুঁকেই তো...!

আরে, তাই তো! এ তো খুব সোজা হিসাব! ওসি সাহেব সহাস্যে বললেন। কিন্তু তাতে উপস্থিত গ্রামবাসী খুব একটা মাথা নাড়ল না। এমন কি, স্যারের সাগরেদ ছোটো পুলিশও না। মাঝখান থেকে স্যার নিজেই বোকা বনে গেলেন।

টাকা চুরির কেস ক্লিয়ার। কাজটা যে বুধেই করেছে, এ ব্যাপারে কারো মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না।

বুধেও কিছু কম চালাক নয়, যেই সে বুঝেছে সে ধরা খেয়েছে, অমনি সে ছুটে গিয়ে ওসি সাহেবের পা জড়িয়ে ধরল। হাউমাউ করে কেঁদে বলল, স্যার, এবারের মতোন মাপ করি দেন। জীবনে আর টাকার লোভ করব না।

মাফ! আমার অভিধানে মাফ বলে কিছু নেই রে হতভাগা। যা যা, বুড়োর পা ধর গিয়ে। তিনি যদি মাফ করেন তো আমি আর কোনো কসুর করব না। যা যা, শিগগির যা।

অমনি বুধে গিয়ে নাবিলের দাদুর পা চেপে ধরল। আর এদিকে গাঁয়ের সবাই গুবলুর নামে ধন্যি ধন্যি করতে লাগল। গুবলু গোয়েন্দা বটে। দুঁদে গোয়েন্দা ফ্রম কুসুমপুর ভিলেজ!

বদলে যাওয়া একাল

তাজিয়া কবীর

নদীমাতৃক আমাদের এই বাংলাদেশ। যুগের বিবর্তনে আমরা হারিয়ে ফেলছি আমাদের নদ-নদী,খাল-বিল,হাওর গুলো। আগে নদীতে, খালে যেসব সনাতনি যান চলাচল করত, সেগুলো এখন আর দেখা যায় না , যেমন এক মাল্লাই নৌকা, দোমাল্লাই নৌকা, গয়না নৌকা, বজড়া নৌকা, খাসি নৌকা, কলা গাছের ভেলা, তালের ডুঙ্গা ইত্যাদি।

বিদ্যুতের পাখার বাতাসে হারিয়ে গিয়েছে আমাদের গ্রামবাংলার নকশি পাখা ও তালের পাখা। এখন গ্রামেও তালের পাখা দেখা যায় না, কারণ গ্রামের প্রতিটি ঘরেই এখন বৈদ্যুতিক পাখা চলে। যারা একটু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আগানো তাদের ঘরে এয়ারকুলারও চলে। আগে গ্রীষ্মকাল এলেই গ্রামে পড়ে যেত পাখা বানানোর উৎসব। এখন আর তা দেখা যায় না । এই তালের পাখা নিয়ে একটা কবিতাও আছে ;

‘আমার নাম তালের পাখা,
শীতকালেতে দেই না দেখা,
গ্রীষ্মকালে প্রাণের সখা,
যে আগে বলে ভাই,
দাওনা একটু বাতাস খাই।

আমাদের মাঝ থেকে গ্রামবাংলার আরো একটি উৎসব হারিয়ে গিয়েছে। আশ্বিন সংক্রান্তির রাতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে ‘গাশশি’ উজ্জাপিত হতো। ঐ দিন বাড়ির আঙিনায় পাটকাঠি দিয়ে একটি ছোটো ঘর তৈরি করে সারারাত জেগে থাকত সবাই। বনবাদাড় থেকে বিভিন্ন ধরনের পাতা সংগ্রহ করে ডালায় করে সেই ঘরের চালে রেখে দেওয়া হতো। ভোরে সেই পাতা, কাচাহলুদ বেটে গায়ে মেখে সূর্যোদয়ের পূর্বেই পুকুরে গিয়ে গোসল করত মেয়েরা। রাত জেগে ছড়া কেটে কেটে সবাইকে জাগিয়ে রাখত, যেমন ;

‘গাশশি জাগো, জাগো,
ভালো কইরা জাগো।
আশ্বিনে রান্ধে কার্তিকে খায়,
যে বর চায় সেই বর পায়’।

গ্রাম্য মেলা বসত বৈশাখ মাসে, গ্রামের ভাষায় তাকে আড়ং বলা হতো। সেটাও হারিয়ে গেছে। এই মেলায় বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ পুতুল পাওয়া যেত। নকশা করা মাটির হাড়ি এক সাথে পাঁচটা জোড়া লাগানো ধরার হাতল সহ। লক্ষ্মী সরা পাওয়া যেত । সরাতে লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি আঁকা থাকত। লক্ষ্মী হিন্দুদের মনপ্রিয় দেবী। মন্দিরে এ দেবীর পূজা হয় না, হয় ঘরে ঘরে। তাই সবার ঘরেই লক্ষ্মী সরা দেখা যেত।

হারিয়ে গিয়েছে অনেক প্রাচীন নির্মিত স্থাপনা। অনেক অমূল্য প্রত্নসম্পদ। তেমনি এক প্রাচীন স্থাপনা ফরিদপুর জেলার সদরপুর থানাধীন বাইশ রশির জমিদার বাড়ি। কালের গর্ভে এদের বংশধররা না থাকলেও এদের নির্মিত স্থাপনা ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। এই বাড়িতে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাসাদ ভবন। কাছারি ঘর, বৃহৎ পুকুর , শিব মন্দির, দুর্গা মন্দির কমপ্লেক্স, নারীদের স্নানঘাট, বাতিঘর, অন্দরমহলের মন্দির, দৃষ্টিনন্দিত বিভিন্ন শ্রেণির মঠ, যেমন নবচূড়া মঠ, সমাধি মঠ, পঞ্চচূড়া মঠ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অর্ক দাস, পঞ্চম শ্রেণি, জিলা স্কুল, যশোর

গল্প

সাধু নরসুন্দর

হেনা সুলতানা

আমাদের পাড়ায় ছিল এক নরসুন্দর অর্থাৎ নাপিত। সে সবার চুল কাটত। নাপিত হলেও সে আর সবার মতো নয়। নাম তার সাধু। সাধু কিন্তু তার আসল নাম নয়। আসল নামটা যে কি তাই বা কে জানে। পাড়ার সবাই তাকে সাধু নাপিত বলেই ডাকত।

সাধু নাপিতের কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে একটু লালছে ধরনের কোকড়ানো চুল। কথা বলার সময় সে গুলো ঝুমকো জবা ফুলের মতো দুলত। গায়ের রংটা ঠিক তমাল গাছের রঙের মতো। নাক মুখের গড়ন মিলিয়ে প্রায় ফজলি আমের মতো চেহারাটা। আর ছিল ভারি সুন্দর দুটি চোখ। তার শরীরে যা কিছু, যদিও উল্লেখ করবার মতো কিছু নেই ঐ চোখ দুটো ছাড়া। তার চোখ দুটোর মধ্যে লুকিয়ে আছে রাজ্যের মায়া। একটু ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে চমৎকার এক গল্প দাদু। ভারি ভালো মানুষ। তার মতো ভালো মানুষকে আর কী বলে ডাকা যায়? তাই তো লোকে তাকে সাধু বলে ডাকত।

সাধু নাপিতের গায়ে থাকত সব সময় একটা রংচটা নীল হাফহাতা ফতুয়া আর ফতুয়ার দুই পাশে বেসাইজ দুটি পকেট। সেই পকেট দুটির মধ্যেই থাকত চুল কাটার সব যন্ত্রপাতি। পরনে হাটু থেকে একটু নামানো ধুতি। ঘর নেই, সংসার নেই, নেই বৌ ছেলেমেয়েও। মানুষকে বসিয়ে চুল কাটবার জন্যে যে একটা দোকান ঘর দরকার তাও নেই।

এত সব 'নেই' এর জন্যে কিন্তু তার কোনো দুঃখও নেই। তাই বলে কি তার কাছে চুল কাটতে আসা মানুষের অভাব? একটুও নয়। বরং আগে থেকে দিন তারিখ ঠিক করে রাখতে হয়।

কবে কবে তার কাছে চুল কাটা যাবে। দিন ঠিক হলে তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতে হয়।

বোঝাই যাচ্ছে চুল কাটা কাজে সাধু নরসুন্দরের খুব নাম ডাক। ছোটো ছেলেমেয়েদের চুল কাটা ভীষণ যন্ত্রণার বিষয়। বেশির ভাগ দেখা যায় অর্ধেক চুল কাটা নাপিতের হাত ফসকে বেরিয়ে গিয়ে দিব্বি ঘুরে

বেড়াচ্ছে তারা। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। কিন্তু সাধু নাপিতের কাছে বসলেই সব ঠাণ্ডা। ছোটো বড়ো সবার কাছেই সে খুব প্রিয়।

এই জনপ্রিয়তার পিছনে অবশ্য ছোট্ট একটি রহস্য আছে। চুল কাটতে সে যেমন ওস্তাদ, গল্প বলাতেও তেমনি পণ্ডিত। এছাড়াও দেশ বিদেশের ভূত পেতনির গল্প জানত, জানত আরো কত রাজা বাদশার গল্প তার কোনো ঠিকানা ছিল না। তবে কিনা যতক্ষণ চুল কাটা ততক্ষণ গল্প বলা। চুল কাটা শেষ তো গল্প বলাও শেষ। গল্প শোনার লোভে সবাই তার কাছে ছুটত চুল কাটতে। মজার ব্যাপার হলো পাড়ার সবাইকে সে ভালো করে চিনত। আর তাই যে যেমন তার মন বুঝে তেমনি গল্প বানাতো সে।

আমাদের ঝন্টু মামা। দেশ বিদেশে ঘোরা জ্ঞানী গুণী মানুষ, তিনিও খুব ভালো লোক। কিন্তু ভালো লোকদের মধ্যে সবই যে ভালো ভালো গুণ থাকবে তা কিন্তু ঠিক নয়। গুণ বিচারে ঝন্টু মামার একশর মধ্যে একশ পাওয়া উচিত কিন্তু তাকে দিতে হবে নিরানব্বই। একশ থেকে এক কম। এই এক কম পাওয়ার কারণ হচ্ছে চুলের ব্যাপারে তিনি অসম্ভব খুঁতখুঁতে। যতদিন না ভালো সেলুন পাবেন, যতদিন না 'এ' গ্রেড পাওয়া নরসুন্দর পাবেন ততদিন চুলের আগাটি পর্যন্ত কাউকে ছুঁতে দেবেন না। ততদিনে ঝন্টু মামার চুল যদি মাথা থেকে নেমে ঘাড়ে আসে, ঘাড় থেকে পিঠে তারপর পিঠ থেকে যতদূর ইচ্ছে যে দিক খুশি চলে যাক তাতে কারো কিছু করার নেই। চুলের ব্যাপারে এতটাই তার নাক উঁচু ভাব। কোনো নাক উঁচু লোককে একশতে একশ দেওয়া ঠিক নয়।

কিছুদিন হয় ঝন্টু মামা দেশে ফিরেছেন। তাকে পেয়ে আমরা খুব খুশি। এবার তাকে দেখে আমাদের কিছুটা মন খারাপই হলো। কারণ তার চুলের অবস্থা দেখছি ভবা পাগলার চাইতেও খারাপ। এই হলো বড়ো সমস্যা। দুনিয়ার কত দেশ ঘুরেছেন, কত এ গ্রেড নাপিতের কাছে চুল কেটেছেন। তবে কিনা যতবড় নাপিতই হোক না কেন, চুল কেটে তাকে কেউ সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

এমনিতেই ঝন্টু মামার মাথাটা একটু মোটা। মানে বড়োসড়ো। অনেকদিন ভালো কোনো নাপিত পাওয়া যায়নি বলে বর্ষার পানিতে গজিয়ে ওঠা বেয়াড়া আগাছার মতো বেড়েছে তার মাথার চুলগুলো। গায়ে যেমন তেমন এ অবস্থায় তাকে লাগছে একটা মাথা সর্বস্ব সিংহের মতো। এ অবস্থা দেখে আমাদের একটুও ভালো লাগছিল না। তাই আমরা কয়েকজন মিলে অনেক সাধ্য সাধনার পর ধরে আনলাম সাধু নরসুন্দরকে। ঝন্টু মামা যে মানুষ, সহজে কী তাকে পাতে তোলেন? মুখ ঘুরিয়ে বসে রইলেন উলটো দিকে। তাকে সিধে দিকে ঘুরাবার জন্যে কথা বলতে হলো বিস্তর। তারও চাইতে বিস্তর বোঝাতে হলো যে এ যেমন তেমন কেউ নয়, সাধু নরসুন্দর বলে কথা।

বাজারে গল্প চালু আছে, একবার বঙ্গদেশে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসে নাকি সাধু নরসুন্দরের নাম ডাক শুনে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন তাকে। মুখে চুল দাড়ি কাটার কথা বললেও সাধুর মুখে গ্রামীণ ভূত এবং ভূতুড়ে গল্প শোনাই ছিল কবির উদ্দেশ্য। তো উর্মিমালার মতো ঢেউ খেলানো কবির চুল দেখে সাধু নাপিত নাকি বলেছিল, আরে রাম! একি কাটার জিনিস? এ যতই বাড়বে ততই দেশের মঙ্গল। তা শুনে কবি মনে মনে খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, তা বেশ তো চুল কাটতে হবে না, তার বদলে আমায় দুটো গল্প শুনিয়ে যাও। তো সাধু নাপিত এমনই গল্প শুনিয়ে ছিল যে কবির একেবারে তাক লেগে গিয়েছিল। এমনই ছিল তার গল্প বলার কারিশমা।

শুধু কি তাই? কিছুই না, কারো মাথা ন্যাড়া করে দিলেও সে খুশি মনে মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতো এমনটি আর হয় না। সাধু নাপিতের কাছে চুল কাটে একজনে কিন্তু তার চার পাশে বসে থাকে আরো দশজনে। এই হচ্ছে আমাদের সাধু নরসুন্দর। এদিকে আমাদের ঝন্টু মামারও অল্প বিস্তর গল্প শোনার বাতিক আছে। সব শুনে টুনে শেষটায় নিমরাজি হতে হতে পুরোটাই রাজি হয়ে গেলেন মামা। ঝন্টু মামাকে জল চকিতে বসিয়ে আমরাও বসে গেলাম তার চারপাশে। সাধু নাপিত একটা ধবধবে চাদর বের করে ঝন্টু

মামার গলা পর্যন্ত জড়িয়ে দিল। তারপর তার সেই বেসাইজ পকেট থেকে খুর, কাঁচি বের করতে না করতেই চলতে শুরু করল তার গল্পের ট্রেন।

বিশাল বন। চারদিক শুনশান। ঝিঁঝি পোকা ছাড়া আর কিছুর শব্দ পাওয়া যায় না। ঝিঁঝি পোকারা ক্লান্ত হয়ে গেলে গান শুরু করত মৌমাছিরা। এই বনের একধারে বাস করত এক গরিব কাঠুরিয়া। নাম তার সুখাই। কিন্তু সুখাই বলে কে তাকে ডাকবে? তার স্বভাবটা যেন কেমন কেমন। মানে খুঁতখুঁতে। তাই সুখাই না ডেকে গ্রামের সব লোকে তাকে খুঁতাই বলে ডাকত।

ঝন্টু মামা একটু আরাম প্রিয় মানুষ। বুঝি বা ততক্ষণে সাধু নাপিতের হাতের জাদুতে আরাম পেতে শুরু করেছেন। চোখের পাতা এলিয়ে আছে পুসি বিড়ালের মতো। হাতের সাথে সাথে সাধুর মুখও চলছে।

– তা ভাই খুঁতাইয়ের ঘরে সুখ ছিল না একটু, সুখ ছিল না তার মনেও। সারাদিন কাঠ কেটে তার দিন কাটত আর ঘরে ফিরত নিজের কপালকে গালমন্দ করতে করতে। সবাই খায় পায়ের উপর পা তুলে আর সে কি না সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খেটেও পেট পুরে দুটো খেতে পায় না। খুঁতাই কাঠ কাটে আর এই সব কথা বলে মুখে ফেনা তোলে। এই ভাবে তার দিন কাটে।

একদিন হলো কি, বনে কাঠ কাটতে কাটতে খুঁতাই দেখে বন আলো করে লোক লস্কর নিয়ে হাতি ঘোড়ায় চেপে এক রাজপুত্র চলছে শিকার করতে। তা দেখে বনের গাছপালা, পশু পাখি সবাই খুশি হলো। কিন্তু খুঁতাই খুশি হবে কি তার ভারি হিংসে হলো। আর বুকের ভেতর থেকে গভীর একটা দুখের নিশ্বাস ফেলে বলল – আহারে এই রকম রাজপুত্র যদি আমি হতে পারতাম তাহলে কী মজাই না হতো! খুঁতাইয়ের বলার আর দোষ কী?

আশেপাশে কেউ ছিল কিনা কে জানে

যে শোনার কান খুলে সেই শুনে ॥

তক্ষুণি সে খুঁতাইকে রাজপুত্র বানিয়ে দিল। খুঁতাই নিজেকে দেখে নিজেই চিনতে পারে না। কিছুক্ষণ আগেই তো সে কাঠুরিয়া ছিল। আর এখন রাজপুত্র? সে কী এই দিন দুপুরে স্বপ্ন দেখছে? মহা ভাবনায় পড়ে গেল সে। কিন্তু ভাবনা করলে তো চলবে না। তাকে তো এখন শিকারে যেতে হবে। খুঁতাই চলল ঝকমকে জামা পরে ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে শিকার করতে। খুঁতাই চলছে তো চলছেই। কিছুদূর যেতে না যেতেই বড়ো ক্লান্ত হয়ে পড়ল সে। কারণ সেদিন ছিল সূর্যের গায়ে আকাশ পাতাল জ্বর। সেই জ্বরের তাপে তার চোখ মুখ কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সব নেতিয়ে পড়েছে। খুঁতাই বোকা সোকা মানুষ। সে কি আর অত কি জানে? তার হিংসুটে মন ভেবে নিল রাজপুত্রের চাইতে নিশ্চয়ই সূর্যের ক্ষমতা বেশি। মনে মনে সে ভাবল রাজপুত্র হয়ে কোনো লাভ নেই। সে বলল সূর্য হতে পারলে বেশ হয়।

বনের ধারে কে ছিল কে জানে

যার শোনার সে কান ভরে শোনে ॥

খুঁতাই রাজপুত্র ছিল হয়ে গেল সূর্য। সে ভারি খুশি হলো। আকাশের পিঠে উঠে মনের আনন্দে কিরণ বিলাতে লাগল। কিন্তু খুঁতাই তো লেখাপড়া জানত না তাই কিরণ দেওয়ার রিমোটটা ঠিকমতো চালাতে পারছিল না। তাই কখনো তাপ কমে যাচ্ছিল আবার কখনো খুব বেড়ে যাচ্ছিল। ফলে যা হবার তাই হলো। খুঁতাইয়ের উলটাপালটা রিমোট চালাবার জন্যে বন জঙ্গল সব পুড়ে গেল। চারিদিক খাঁ-খাঁ করতে লাগল। বনের পশু পাখিরা প্রাণের ভয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি করে এক ভয়াবহ কাণ্ড বাধিয়ে দিল।

খুঁতাইয়ের তখন মাথা গরম। পাগল পাগল অবস্থা। আবার সে রিমোট হাতে তুলে নিয়ে প্রাণপণে রিমোটের বোতাম টিপতে লাগল। উলটাপালটা কোথায় চাপ পড়ল কে জানে। তবে এবার তাপ কমতে শুরু করল। তাপ কমতে কমতে এমন হলো যে অত বড়ো গনগনে সূর্যটা একটা কালো জাম হয়ে আকাশ জোড়া মেঘের হাঁড়িতে ঢেকে গেল। এই ঘটনা দেখে খুঁতাই যত না অবাক হলো তার চাইতে বেশি দুঃখ পেল। মনের দুঃখে সে তখন আর কী করবে? সব কিছু দেখে শুনে তার মনে হলো মেঘই হচ্ছে সবচেয়ে ক্ষমতাবান। নইলে অমন তেজি সূর্যটাকে মেঘ কেমন টপ করে খেয়ে ফেলল।

মেঘের আড়ালে কে জানে কে ছিল

যার শোনার কান ভারি করে সে শুনল ॥

খুঁতাইকে সে মেঘ করে দিল। মেঘ হতে পেরে সে খুব খুশি হলো। খুঁতাইয়ের ছিল খুব বেড়াবার শখ। সে মেঘ হয়ে দেশে দেশে ভেসে ভেসে মনের সুখে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর মনের আনন্দে বৃষ্টি ঝরাতে লাগল। বৃষ্টি ঝরায় সারাদিন ঝর ঝর করে আর গান গায়। ক'দিন বেশ মজাতেই কাটছিল। কিন্তু আর তো ভালো লাগছে না। একটানা বৃষ্টিতে সবাই খুব ঝালাপালা হয়ে উঠেছে। বড়ো কথা সে নিজেও বিরক্ত। এদিকে হয়েছে আর এক বিপদ। বৃষ্টি বাড়ানো, কমানো বা বন্ধ করার রিমোটটা খুঁতাই কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে। এখন খুঁজে খুঁজে হয়রান। কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সে আর বৃষ্টি থামাতে পারল না। অতএব, নদী-খাল-বিল ভরে গেল। একুল ওকুল ভরে নাচতে নাচতে বন্যা এসে গেল। খুঁতাই মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গেল।

চারিদিক ভেসে গেল, ভেসে গেল রব উঠলেও দেখা গেল একটা পাহাড় ঠিক দাঁড়িয়ে আছে অটল। পহাড়টাকে বন্যা ভাসিয়ে নিতে পাড়ল না। লোভী খুঁতাই তখন ভাবল আরে পাহাড়টার তো অনেক ক্ষমতা। আমি যদি পাহাড় হতে পারতাম তাহলে সবচেয়ে ভালো হতো। ভাবনার আর দোষ কী?

পাহাড়ের ওপারে কে ছিল কে জানে

আড়াল থেকে সে খুঁতাইয়ের কথা শোনে ॥

ওমনি খুঁতাই পাহাড় হয়ে গেল। বন্যা যেখান থেকে এসেছিল নাচতে নাচতে আবার সেখানে চলে গেল। বন্যা চলে যাবার পর লোকজন আবার ভাঙা ঘরবাড়ি সারাই করে, কেউ বা নতুন করে ঘর তুলে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল। কেবল সবার অলক্ষে একলা পাহাড়টাকে ঘিরে ধরল অসংখ্য গাছপালা আর নানা রকম লতাপাতায়। কোথাও এতটুকু তিল ধরাবার জায়গা থাকল না। তা দেখে খুঁতাইয়ের মন বড়োই খারাপ হলো। বনের সবুজ গাছপালা ঘিরে রাখাতে তাকে যে কত চমৎকার লাগছিল সে কথা খুঁতাই একবারও ভাবল না। প্রকৃতি পাগল মানুষরা তাকে দেখে কত যে প্রশংসা করল তার ঠিক ঠিকানা নেই। কিন্তু সে সব কথা সে কানেই তুলল না। সে কেবল মনে মনে খুঁতখুঁত করতে লাগল। বনের এত ক্ষমতা যে এই বিশাল পাহাড়কে ঢেকে দিল? তবে আর এতদিন পাহাড় হয়ে থাকা কেন? কী লাভ পাহাড় হয়ে? না আর একদিনও সে পাহাড় হয়ে থাকতে চায় না। খুঁতাই বন হতে চায়। মনের ইচ্ছে জাগতে না জাগতেই কে জানে মৌফুলি বনের আড়ালে কে ছিল

মহূর্তে খুঁতাইয়ের মনের কথা সে জেনে গেল ॥

হতভাগা খুঁতাই ধীরে ধীরে মস্ত এক বন হয়ে গেল। তারপর বনের মধ্যে সবচেয়ে মাথা উঁচু গাছটি হয়ে মনের আনন্দে সে বন পাহারা দিতে লাগল। কিন্তু হলে কী হবে! খুঁতখুঁতে মানুষের মনের আনন্দ, সুখ বেশি দিন টেকে না।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে খুঁতাই দেখে এ কী কাণ্ড? একটা লোক চকচকে কুড়াল হাতে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সে খুব ভয় পেয়ে গেল। ততক্ষণে লোকটা কাছে এসে খটাখট কুড়াল চালাতে লাগল তার গায়ে। সে কিছুতেই বাধা দিতে পারল না। কারণ গাছের তো আর হাত পা নেই। কি আর করা, সে কাঁদতে বসে গেল।

ভাগ্য ভালো কাছে পিঠে কে যেন ছিল–

খুঁতাইয়ের কান্না তার কানে পৌঁছে গেল ॥

খুঁতাই ওমনি মানুষ হয়ে গেল। কি আশ্চর্য সে একটা কুড়ালও উপহার পেল।

এই পর্যন্ত বলে থামল সাধু নরসুন্দর। ততক্ষণে তার হাতটাও থেমে গেছে। চুল কাটা শেষ। কিন্তু হলে কি হবে। ঝন্টু মামার সে দিকে খেয়াল নেই। তিনি সাধু নাপিতের গল্পে এতটাই ডুবে গিয়েছিলেন যে তাকে সেখান থেকে উঠায় কার সাধ্য। ঝন্টু মামা বললেন তারপর? তারপর কী হলো সেই মানুষটার?

শুধুমাত্র ঝন্টু মামার সম্মানে চুল কাটা শেষ হওয়ার পরও আর একবার মুখ খুলল সাধু নরসুন্দর।

– তারপর খুঁতাইয়ের মনের খুঁতখুঁতে অসুখটা ভালো হয়ে গেল। তারপর থেকে সে এক মনে নিজের কাজ

করত আর সবাইকে খুশি মনে বলত কাঠুরিয়ার চেয়ে রাজপুত্র ভালো, রাজপুত্রর চেয়ে সূর্য ভালো। সূর্যের চেয়ে মেঘ, মেঘের চেয়ে পাহাড়। আর পাহাড়ের চেয়ে বন আর সবচেয়ে ভালো আমি। আমি হলাম সুখাই। সেই থেকে তার খুঁতাই নাম ঘুঁচে গেল। এখন সবাই তাকে সুখাই বলে ডাকে। গাঁয়ে তার মতো সুখি মানুষ আর একটাও নেই।

এইসব বলতে বলতে সাধু নরসুন্দর তার ঝোলা থেকে একটা আয়না বের করে ঝন্টু মামার মুখের সামনে ধরল। ঝন্টু মামার মুখটা খুব খুশি খুশি। আয়নার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাহ ভারি চমৎকার চুল কাটা হয়েছে তো!

জীবনে এই প্রথম ঝন্টু মামা তার চুল কাটা নিয়ে এরকম সুন্দর মন্তব্য করলেন। এবার নিশ্চয়ই তাকে একশতে একশ দেওয়া যায়। এর পুরো কৃতিত্ব অবশ্যই আমাদের সাধু নরসুন্দরের। ঝন্টু মামা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ধন্যবাদ জানালেন।

বাংলাদেশের যেই খানে যাও

মাহমুদ বিক্রম

বাংলাদেশের যেই খানে যাও দেখবে সবুজ সব,
দিগন্তকে ছুঁয়ে আছে অনাদি গৌরব।
বাংলাদেশের আকাশ জুড়ে মেঘের শতদল,
ইচ্ছেমতো ছুটোছুটি স্বাধীন চলাচল।
বাংলাদেশের কোথায় যাবে কোন সে গাঁয়ে ভাই,
পাখপাখালির মিষ্টি ধ্বনি শুনতে মানা নাই।
বাংলাদেশে বারো মাসে ছয়টি ঋতু হয়,
নতুন ঋতু নতুন আভা অনন্য বিস্ময়।
বাংলাদেশের মানুষগুলো সহজ সরল মন,
বাঁশের বনে চপল হাওয়ার নাচন সারাক্ষণ।
বাংলাদেশের সবাই কবি সবাই ছন্দময়,
বাউল গানের মর্মসুরে মন যে উদাস হয়।
বাংলাদেশের সবাই জানে মাতৃভাষার দাম,
ইতিহাসের পাতায় লেখা রফিক শফিক নাম।
বাংলা আমার দেশ জননী বাংলা আমার প্রাণ,
বুকে আমার নিত্য বাজে বাংলাদেশের গান।

ফাইরুজ ওয়াসিমা ইসানা, পঞ্চম শ্রেণি, মাইলস্টোন প্রিপারেটরি কে.জি স্কুল, উত্তরা, ঢাকা

জষ্ঠিদিনের দুপুরবেলা

ফারুক নওয়াজ

বাবলা পাতার রিনিঝিনি হাওয়ার দ্যোতনা..
রোদ-ঝলমল দুপুরবেলা ভোরের মতো না।
ঝাবুকপাতার ঝুনঝুনানি, ঘুঘুর ঘু-ঘু ডাক-
মরিচ-ক্ষেতে হামলে পড়ে ভুরুই পাখির ঝাঁক।

ঝিলকে ওঠা দুপুর যেন রোদের জোছনা..
মিঠেল বিকেল কিংবা ধূসর সাঁঝের মতো না।
গুলতি চোখের খোড়ল প্যাঁচা গুলগুলিয়ে চায়-
চালতা ডালে বুলবুলিরা ঘাড় দুলিয়ে গায়।

নিম মধুতে মুখ চুবিয়ে মৌমাছি খায় ঢুল..
কাপড় মেলার তারের ওপর চেঁচায় বায়সকুল।
কুশর ক্ষেতে চতুর শেয়াল ঢুকল লুকিয়ে-
ঝিনিক ঝিনিক ঝিল্লিগুলো উঠল মুখিয়ে।

জষ্ঠিদিনের দুপুরবেলা মজার কাহিনি
আমের বনে ছুট লাগাতাম দস্যিবাহিনী।
আম কুড়িয়ে হল্লা করে বাগান মাতাতাম-
দিনগুলো হায় হারিয়ে যাবে কেউ-কি তা ভাবতাম?

মধুমাসে

আব্দুস সালাম

মাঠঘাট চৌচির ঘাম ঝরে বৌ-ঝির
বালুচর ধু-ধুরে
গড়গড় ডাকে মেঘ বাড়ে বায়ু বাড়ে বেগ
ওই দেখ সুদূরে।

হাঁসফাঁস দুপুরে ডানপিটে পুকুরে
পড়ে হায় আছড়ে !
ঝম ঝম বৃষ্টি কী যে অনাসৃষ্টি!
ডোবা ভরা মাছরে।

টকটকে লাল লিচু ভারে শাখা হয় নিচু
বুকভরা মধুরে
গাছে গাছে পাকা তাল মধুকর বেসামাল
পিঠা হাতে বধূরে।

ফালি ফালি তরমুজে পেট ভরি চোখ বুজে
বেল আতা ফুটিরে
টক টক স্বাদ খেতে আনারস ভরা ক্ষেতে
ফলবাগে ছুটিরে।

টসটসে কালো জাম কাঁঠাল ও পাকা আম
সবে ভালোবাসেরে
লাল লাল জামরুল সফেদাও তুলতুল?
আসে মধুমাসেরে।

জুনায়েদ তৌহিদ, পঞ্চম শ্রেণি, এস এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস

শাহানা আফরোজ

প্রতি বছর ৫ই জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বন্ধুরা আমরা সবাই জানি আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। প্রাকৃতিক পরিবেশ আর সামাজিক পরিবেশ নিয়েই আমাদের জীবন। এই দুই পরিবেশ একটি অপরটির পরিপূরক এবং নির্ভরশীল। সুন্দর পরিবেশ সুস্থ জীবন।বিশ্বনন্দিত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'প্রাণ' কবিতায় বলেছেন- মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই'। এই সুন্দর ভুবনের পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়েই সারা বিশ্বে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

৫ই জুন জাতিসংঘের মানবিক পরিবেশ কনফারেন্স (United Nations Conference on the Human Environment) শুরু হয়েছিল। কনফারেন্স হয়েছিল ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ থেকে ১৬ই জুন অবধি। কনফারেন্স- এ ঐ বছরই চালু হয়েছিল জাতিসংঘের সাধারণ সভা। তখন থেকেই প্রতি বছর এই দিবস পালিত হয়ে আসছে। দিবসটি প্রথম পালিত হয় ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। প্রতি বছর দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে পালিত হয়।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, হিম প্রবাহে বরফ গলা, সমুদ্রপৃষ্টের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, সারা পৃথিবীই এখন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে গেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ একুশ শতকে আরো বেশি করে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমগ্র বিশ্বই এখন হুমকির মুখে।পরিবেশ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যতই খারাপ সময় আসুক না কেন, মানুষকেই গড়তে হবে নতুন সবুজের পৃথিবী। সবাই এখন বুঝতে পারছে, এই বন, নদী, পাহাড়, সমুদ্র না থাকলে আমরা বাঁচব না, বাংলাদেশ সহ পৃথিবী বাঁচবে না। পরিবেশ প্রকৃতির বিরুদ্ধে যতই খারাপ সময় আসুক না কেন, মানুষকেই গড়তে হবে নতুন সবুজের পৃথিবী। আর এ লক্ষ্য নিয়েই পালিত পরিবেশ দিবস। বন, সবুজ, জীববৈচিত্র্যকে ভালোবাসব চিন্তায় এবং কর্মে সবুজের শ্যামলিমায় প্রকৃতিকে রক্ষা করব। এই চেতনায় বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবী সবুজের আচ্ছাদনে পরিপূর্ণ হবে। প্রকৃতির সুন্দরতায় ভরে উঠবে সারাবিশ্বের সকল প্রান্তর। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই হোক আমাদের দীপ্ত শপথ।

বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস

বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস ১৭ই জুন। মরুকরণ প্রতিরোধ ও খরার প্রভাব মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টিই দিবসটি পালনের উদ্দেশ্য। ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর-এ ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি (United Nations General Assembly) ১৭ই জুনকে বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। ১৯৯৫ সালের ১৭ ই জুন থেকে সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে বিশ্ব মরুকরণ ও খরা প্রতিরোধ দিবস।

এ মুহূর্তে বিশ্বের প্রায় ২ বিলিয়ন মানুষের জীবন-জীবিকা খরা ও মরুকরণের ফলে চূড়ান্ত হুমকির মুখে। পৃথিবীর প্রায় ৩০ শতাংশ ভূমি এখনই শুষ্কতার আওতায় চলে গেছে। এই সমস্যা দিনে দিনে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। আজকের দুনিয়ায় পরিবেশের বড়ো চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে মরুকরণ অন্যতম। জাতিসংঘ বলছে, পৃথিবীর প্রায় দেড়শ কোটি মানুষ বেঁচে থাকার জন্য ক্ষয়িষ্ণু ভূমির ওপর নির্ভরশীল। এই ভূমিক্ষয় জলবায়ু পরিবর্তনকে আরও ত্বরান্বিত করছে, যা আমাদের বেঁচে থাকার জন্য বিপদের কারণ।মরুকরণ বিস্তার রোধে প্রয়োজন পরিবেশ সম্মতভাবে, সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য এবং অর্থনৈতিকভাবে সম্ভাবনাময় পদ্ধতিতে ভূমির ব্যবহার। এটিই হচ্ছে আন্তর্জাতিক মরুময়তা দিবসের মূল উপলব্ধি।

আমীরুল ইসলাম-এর দুটি ছড়া

ঘর

পার্কের পাশে থাকি আমরা
আটতলাতে ঘর
সবুজ পার্ক দেখে ভাবি
এটাই তেপান্তর।

সবুজ মবুজ অবুঝ যত
গাছপালাদের ভিড়
পার্কের পাশে থাকি আমরা
নই মোটে অস্থির।

বিকেল বেলা খেলতে যাই
গাছেরা কথা কয়।
সবুজ পাতায় জীবন নাচে
কিসের আবার ভয়।

আটতলাতে থাকি আমরা
আকাশটাকে ছুঁই
গাছ আমাদের বন্ধু আমরা
গাছের পাশে শুই।

পার্ক মানে তো পাখপাখালি
গাছগাছালির ঘর।
আমার কাছে পার্ক মানে তো
ঘরের তেপান্তর।

বেড়াল

বেড়াল ছানা বেড়াল ছানা
খাচ্ছে আইসক্রিম
কোথায় পাব কোথায় পাব
বেড়াল ছানার ডিম?

বেড়াল ছানা ডিম পাড়ে না
টাকডুম টাকডুম
টিকটিকিদের ঘুমের পাশে
বেড়াল ছানার ঘুম।

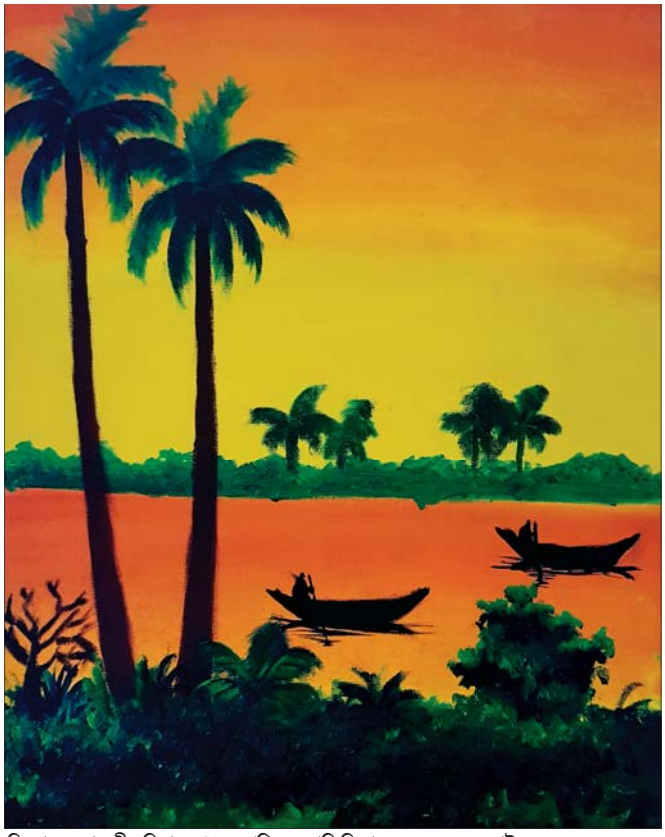

মিনহাজুল আবেদীন সিয়াম, পঞ্চম শ্রেণি, সরকারি বিজ্ঞান কলেজ সংযুক্ত হাই স্কুল

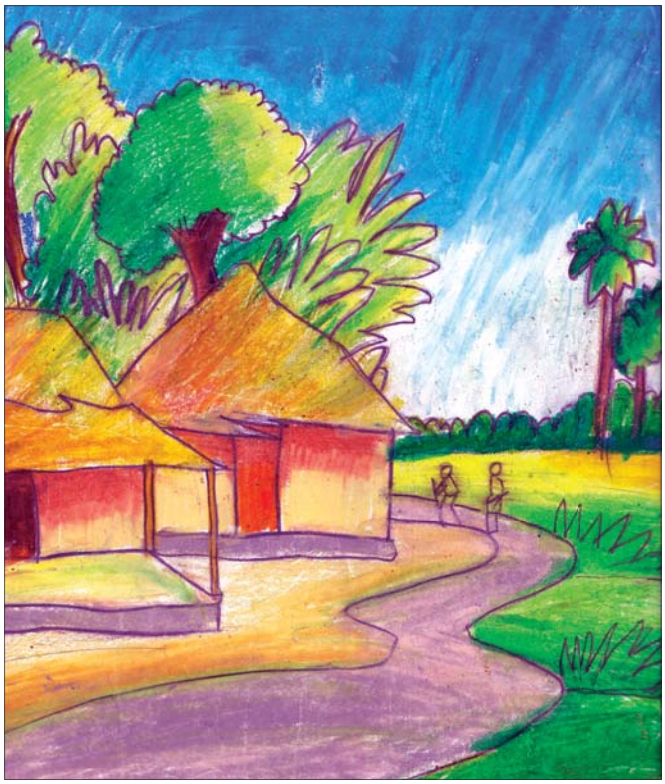

তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ, দ্বিতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল ইংলিশ ভার্সন স্কুল, বনশ্রী

পশুপাখির বিচিত্র খবর/হাফিজুর রহমান

কুকুরকে বেঁধে রাখলে জেল জরিমানা

কুকুরকে একটানা ২৪ ঘণ্টা বেঁধে বা আটকে রাখলে তা নিষ্ঠুরতা হিসেবে গণ্য হবে, তাই ছয় মাসের জেল ভোগের পাশাপাশি গুণতে হবে জরিমানা। এমন বিধান রেখে প্রাণিকল্যাণ আইন, ২০১৯- এর খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক প্রাণীর মালিক বা তত্ত্বাবধানকারীর দায়িত্ব হবে যৌক্তিক কারণ ছাড়া ওই প্রাণীর প্রতি কল্যাণকর ও মানবিক আচরণ করা এবং নিষ্ঠুর আচরণ করা হতে বিরত থাকা। এটা এই আইনের জেনারেল ইন্সট্রাকশন। মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন, খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য প্রাণী জবাইকালে এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গকালে যে-কোনো ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি কর্তৃক নিজস্ব ধর্মীয় আচার অনুযায়ী কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে তাকে নিষ্ঠুরতা হিসেবে গণ্য করা হবে না।, কুকুরকে কোনো প্রকার চলাফেরার সুযোগ না দিয়ে একটানা ২৪ ঘণ্টা বা এর বেশি সময় বেঁধে বা আটকে রাখলে নিষ্ঠুরতা বলে গণ্য হবে।

বিড়াল নামাতে মই

বাংলাদেশ সচিবালয়ের ভেতরে সোনালি ব্যাংকের পাঁচ তলা ভবনের চার তলার কার্নিশে উঠে আর নামতে পারেনি একটি বিড়াল। না খেয়ে দুর্বল হয়ে গেলেও নামার চেষ্টা করতে থাকে সে। কিন্তু কোনোভাবেই বিড়ালটি লাফ দিয়ে বা অন্য কোনোভাবে নামতে পারেনি।বিড়ালটির প্রাণপণ চেষ্টা দেখে সচিবালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নামানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু নিজেরা ব্যর্থ হন। তবে হাল ছাড়েননি। শেষ পর্যন্ত ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় মই দিয়ে বিড়াল টিকে নামানো হয়। নামানোর পর বিড়ালটি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে ব্যাংকের পেছনে ঝোঁপে চলে যায়। বিড়ালটি দুর্বল হয়ে পড়লেও সুস্থ ছিল।

বিড়াল নামাতে ফায়ার সার্ভিস

দেশের প্রশাসনযন্ত্র সচিবালয়ে কুকুরের আক্রমণে গাছে উঠে একটি বিড়াল। কিন্তু গাছে উঠেও রক্ষা নেই। বিড়ালকে ধাওয়া দেয় দুষ্টু কাক। শান্ত প্রাণী বিড়ালটি ক্রমাগত কাকের হামলা আর অভুক্ত থাকায় ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এমন অবস্থা তিন দিন ধরে লক্ষ্য করেন সচিবালয়ের একজন ড্রাইভার। এরপর খবর দেন ফায়ার সার্ভিসকে। ১৭০ ফুট অর্থাৎ ১৭ তলায় উঠতে সক্ষম স্কাই লিফট নিয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুই কর্মীর সাবধানী তৎপরতায় হাতে আসে বিড়ালটি, আদর করে আলতো করে ধরে বিড়ালটিকে নিচে নামিয়ে আনা হয়। এরপর বিড়ালটিকে ক্যান্টিনে নিয়ে যান ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা। সেখানে ভাত, পানি, মাছের কাঁটা খেতে দেওয়া হয়। এরপর লেজ উঁচিয়ে বিড়ালটি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে দৌড় দেয়।

কুকুরের আলুর দোকান

প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার যুগে কুকুর দোকান চালাচ্ছে। সম্প্রতি ইন্টারনেটে দুনিয়ায় ভাইরাল হওয়ার এক ভিডিওতে এমনটাই দেখা গেছে। আলুর দোকানের 'পরিচালক' ওই কুকুর কুনের বয়স মাত্র তিন বছর। কুকুরটি যে দোকানে বসে আলু বিক্রি করছিল সেটি অবস্থিত জাপানের হোক্কাইডো দ্বীপে। ভিডিওতে দেখা যায়, আলুর দোকানে দুই পা তুলে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে কুকুরটি। বিক্রি করছে আলু। লোকজন সেখান থেকে আলু কিনে দাম দিয়ে চলে যাচ্ছে। । দোকানদার কুকুর হওয়ায় টাকা ফেরত দিতে পারে না। দোকানের পাশে জাপানি হরফে লেখা রয়েছে, 'আমি কুকুর, তাই টাকা ফেরত দিতে পারব না'। ক্রেতারা আলু দাম দেয় নির্দিষ্ট খুচরো টাকা দিয়ে। এছাড়া যারা অতিরিক্ত টাকা দেন, সেই টাকা থেকে কুনের খাবার কেনা হয়। আলুর দোকান চালানো কেনের কাছে কোনো খেলা নয়। কিংবা শখের বসেও কুন এটা করে না। তাকে দোকানে নিয়মিত দেখা যায় আলু বিক্রি করতে। আর কাজ শেষে সন্ধ্যাবেলায় মালিকের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফেরে।

টিয়া পাখির 'জেল'

সম্প্রতি ব্রাজিলের পিয়াউই প্রদেশের এক অবৈধ ব্যবসায়ী তার বাড়িতে একটি টিয়া পাখি পোষেন। জানালাহীন ওই বাড়ির সামনে পাখিটি রাখা হতো। বাড়িতে পুলিশ এলেই টিয়া পাখিটি বলে উঠতো, 'মামেয় পুলিশিয়া'। এভাবেই বাড়িতে যে পুলিশ এসেছে সেই সংকেত দিত পাখিটি। ।' এমন কাজের জন্য টিয়া পাখিটিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। আটক করে থানায় নিয়ে আসার পর একটি কথা কিংবা শব্দও করেনি টিয়াটি। সেই পুলিশ কর্মকর্তা জানালেন সারাক্ষণ পাখিটি চুপ করে বসে ছিল। পরে টিয়া পাখিটিকে একটি স্থানীয় চিড়িয়াখানায় রাখা হয়।

নজরদারি চালাতে পোষ্যকে প্রশিক্ষণ

হোমওয়ার্ক করার সময় মনোযোগ ছিল না জিনিয়ার। হোমওয়ার্ক শেষ না করেই স্মার্টফোন ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করে দিত। মেয়ে ঠিক করে হোমওয়ার্ক করছে কিনা, তা দেখতে একজন পাহারাদার রাখতে চেয়েছিলেন বাবা। অনেক চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত বাড়ির পোষা কুকুরটাকেই এই কাজে নিয়োগ করেন তিনি। হোমওয়ার্কে ব্যস্ত মেয়েটির সামনে পড়ার টেবিলে দু-পা তুলে দিয়ে কড়া নজরদারি চালানো কুকুর সহজেই সবার প্রিয় হয়ে উঠে। জানা গেছে, কুকুরটির নাম ফানতুয়ান। দক্ষিণ-পশ্চিন চীনের গুইঝাও প্রদেশের বাসিন্দা জু লিয়াং তাকে মেয়ের হোমওয়ার্কে পাহারা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়েছেন ফানতুয়ানকে। হোমওয়ার্ক করার সময় এই নতুন পাহারাদারকে নিয়ে অবশ্য খুশি জিনিয়াও। একা একা বসে পড়ার থেকে সামনে কেউ থাকলে তার ভালোই লাগে বলে জানিয়েছে সে।

বেড়ালের জন্যে ক্যাফে

ব্রিটেনে চালু হয়েছে বেড়ালদের জন্যে একটি ক্যাফে। ক্যাফের মালিক কেটি জেন গেজি।

ক্যাফেটির নাম দিয়েছেন 'মগ অন দ্য টাইন'। এ ক্যাফেতে বেড়ালদের কথা মাথায় রেখেই মেনু সাজানো হয়েছে। রয়েছে দুধ আর মাছের তৈরি উপাদেয় খাবার, স্যুপ। বেড়াল মালিকদের জন্য রকমারি ফাস্ট ফুড ও পানীয় তো আছেই। এখানে আনা হয়েছে কিছু স্থায়ী বাসিন্দা। বাসিন্দাদের ১০জনই হলো বেড়াল।

আর বেড়ালদের সার্বক্ষণিক চোখে রাখার জন্য প্রতিটি ঘরেই সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করে মুঠোফোনের সঙ্গে সংযোগ দিয়ে রাখা হয়েছে। বেড়ালের জন্য কেটির এ ক্যাফে সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে। লন্ডনের অনেকেই এখন মাত্র পাঁচ পাউন্ডের বিনিময়ে নিজের বেড়ালকে আনন্দ দিতে কেটির ক্যাফে ঘুরে আসেন।

ছোটোদের আঁকায় পাখি

কাজী নাফিসা তাবাসসুম, একাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

ওয়ার্দা বিনতে আমীর, একাদশ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

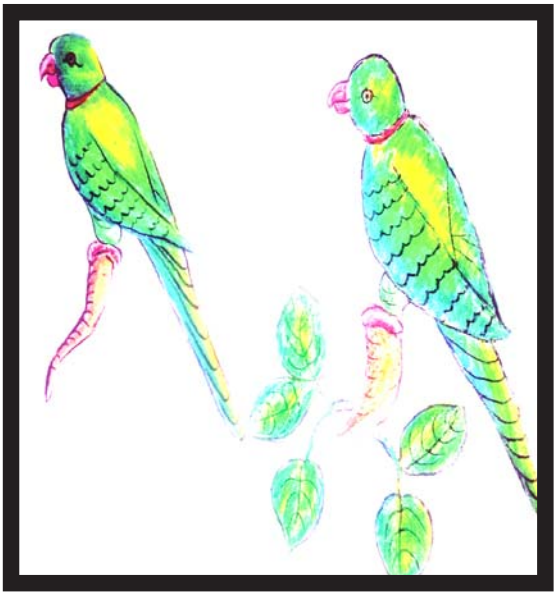

আনিকা তাসনিম, পঞ্চম শ্রেণি, সাতক্ষীরা সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, সাতক্ষীরা

আয়ান হক ভূঁঞা, নার্সারি, স্টার হাতেখড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, পূর্ব রামপুরা

নিবন্ধ

ওর নাম মিনার্ভা

নাজিবা সায়েম

ওর নাম মিনার্ভা। এই বছরের মার্চ মাসের ২৩ তারিখে জোহাইনার বাসা থেকে এনেছিলাম ওকে। জোহাইনার বেড়াল ফিওনার তিন মাসের বেড়াল ছানাই মিনার্ভা। ফিওনার পাঁচটা বাচ্চা হয়েছিল। তিনটা সাদাকালো। আর দুইটা হালকা বাদামি ও সাদার মিশেল, যাকে বলে 'জিনজার' রং। মিনার্ভা সবচেয়ে ছোটো। ওর মাথার কাছে বাদামি ছোপ, লেজে বাদামি দাগ কাটা, আর পুরো শরীর ধবধবে সাদা। খুব সুন্দর, ফুটফুটে একটা বাচ্চা।

২০১৮ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে জন্ম হয়েছিল ওর। খুব ছোট্ট, দুর্বল। খেতে চায় না। আমি বাসায় আনার পর পড়লাম বিপদে। খাওয়ানোটা মুশকিল। আস্তে আস্তে আমি জানতে পারলাম ওর কী কী খাবার পছন্দ। সবচেয়ে ভালোবাসে পুঁটি মাছ। এরপর মুরগির মাংস। অন্যান্য মাছও খায়। রুটি, পাউরুটি, ওট্‌স, কর্নফ্লেক্স খায়। বিকেলে আমার সাথে নাশতায় দুধ দিয়ে বিস্কুট খায়।

সব কিছু খুব সহজে হলো না। মিনার্ভাকে বাসায় আনার ব্যাপারে বাসার কেউ রাজি ছিল না। আম্মু বেড়াল খুব ভয় পান। বেড়ালকে কে দেখভাল করবে? এসব কথা শুনেও আমি অনেক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। বলছিলাম, সব কিছু আমিই সামলাব। আব্বু আমার উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। এক সন্ধ্যায় আব্বুকে নিয়ে জুহাইনার বাসায় গিয়ে মিনার্ভাকে নিয়ে এসেছিলাম। ওর জন্য খাঁচা কেনা হয়েছিল। গাড়িতে রাখা খাঁচায় করে ওকে আনা হলো। খুব কাঁদছিল বেচারি। খাঁচায় থাকতে চাচ্ছিল না। বাসায় আসার পর খাঁচা থেকে বের হলো। তখন শান্ত হলো। এখন ও আমাদের বাসার বাসিন্দা। আম্মু এখনো ভয় পান, কাছে যান না। আমি চট্ করে কোলে নিয়ে ফেলি বলে আম্মুর কাছে যেতে পারে না ও।

মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে আমি বাসার বাইরে যাই। আগে একদমই যেতে চাইত না। তারপর আমি জানতে পারলাম ওর গাছগাছালি খুব পছন্দ। তাই এখন প্রায়ই বের হতে চায়। যখনই ওর সাধ জাগে,

ও বাসার দরজার সামনে বসে 'মিয়াঁও' করে ডেকে ওঠে। তখন আমি ওকে কোলে করে বাইরে নিয়ে যাই। বাইরে ভালোই গাছের মধ্যে মিশে যায়। যখন আমি ওকে খুঁজে পাই না, তুড়ি মারি আর সেই শব্দ শুনে ও দৌড়ে আসে। তাছাড়া মিনার্ভা বাইরে যেতে চায় সিঁড়িতে উপর নিচে ছোটাছুটি করার জন্য। এটা ওর জন্য অনেক মজার একটি খেলা। নানা খেলনা ছোঁড়াছুঁড়ি করেও ও খেলতে পছন্দ করে।

বারান্দায় রাখা আমার সাইকেলটার উপর চড়ে বসে প্রায়ই। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকে আকাশে। চুপচাপ কি যেন ভাবে। ও আসলে খুব ভাবুক। বেড়ালরা কবিতা লিখতে চায় কি না, এখনো বুঝতে পারিনি। কেন যেন মনে হচ্ছে, মিনার্ভা বড়ো হতে হতে বেড়াল-কবি হয়ে উঠবে। ওর মিয়াঁও মিয়াঁও কবিতা আর কেউ না বুঝুক, আমি নিশ্চয়ই বুঝব। কেননা, আমি তো মিনার্ভাকে অনেক ভালোবাসি। মিনার্ভাও আমাকে অনেক অনেক ভালোবাসে। আমার মাথার চুলে থাবা বুলিয়ে দেয়। স্কুল থেকে আসার পর আমাকে দেখলেই ছুটে আসে। আমারও খুব ভালো লাগে ওর সাথে সময় কাটাতে।

সপ্তম শ্রেণি, মাস্টার মাইন্ড স্কুল, ঢাকা

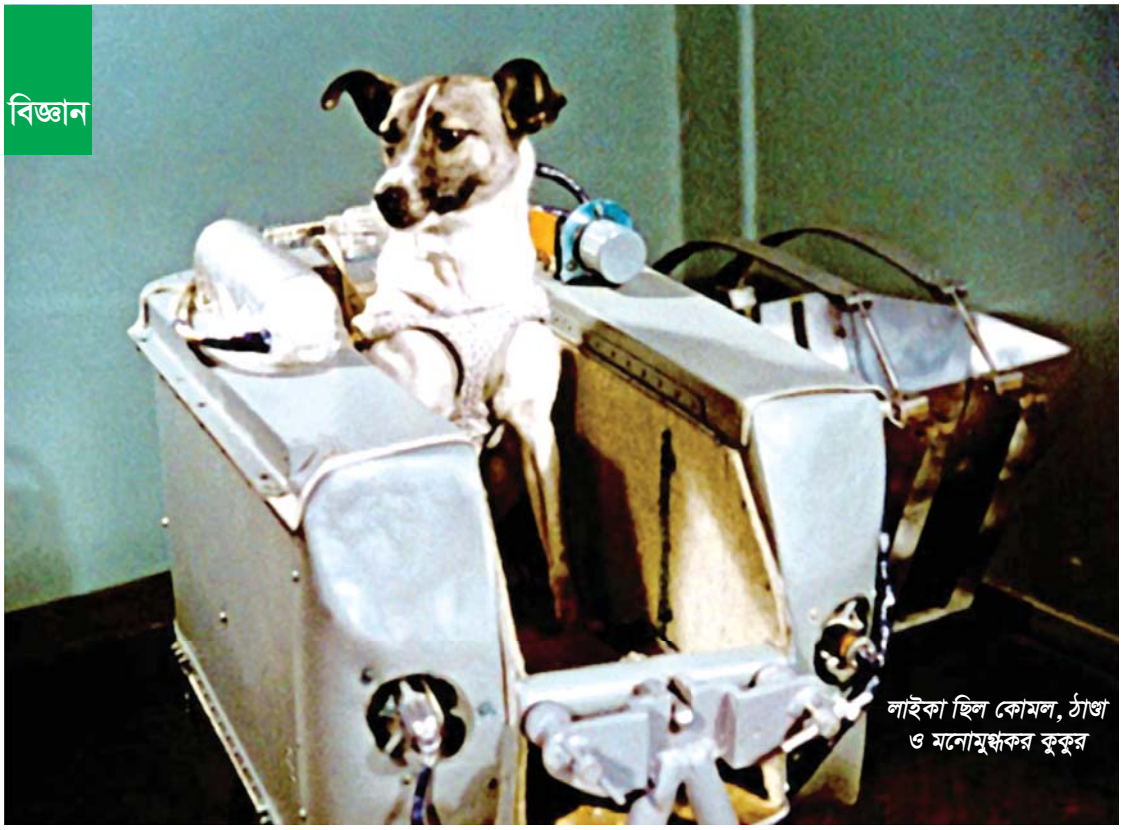

লাইকা ছিল কোমল, ঠাণ্ডা ও মনোমুগ্ধকর কুকুর

মঙ্গল আলোকে নভোচারীদের কাহিনি

নাদিরা মজুমদার

১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসের তিন তারিখ সেদিন। সোভিয়েত ইউনিয়ন 'স্পুতনিক-২' নামক আরেকটি কৃত্রিম উপগ্রহ 'মহাবিশ্বে' পাঠিয়েছে - শুনে তো পৃথিবীবাসীরা বিমূঢ়, অবাক! এই তো সেদিন - গত মাসের চার তারিখে স্পুতনিক-১ পাঠাল না? পাঠাল তো, মাস যেতে না যেতে দ্বিতীয়টি? এবং আরো আশ্চর্য খবর হলো ছোটো সেই উপগ্রহের ভেতরে ছোট্ট একটি কুকুরকে পাঠানো হয়েছে! কুকুরটি প্রাণিকুলের প্রথম প্রতিনিধি হিসেবে আমাদের পৃথিবীকে নাকি প্রদক্ষিণ করবে। আসলে কুকুরটি, পরে যে 'লাইকা' নামে অমরত্ব পায়, প্রাণিজগতের প্রথম প্রতিনিধি ছিল না। সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও রুশরা নানা জাতীয় প্রাণীকে রকেটে বসিয়ে পৃথিবীর বাইরে পাঠিয়ে আসছিল। তা সত্ত্বেও লাইকা কেমন করে যেন খুব ভালো পিআর তথা পাবলিক-রিলেশনস সার্ভিস পায়। ফলে নভোচারিণী লাইকা আমাদের মনোরাজ্যে চিরস্থায়ী ঠাঁই করে নেয়।

'স্পুতনিকে'র 'মুৎনিক'

লাইকার গায়ের লোম কোঁকড়ানো ছিল বলে তাকে 'কুদরিয়াভকা' নামে ডাকা হতো। মার্কিন সাংবাদিকরা আবার 'স্পুতনিক'-এর সঙ্গে মিল রেখে নাম দেয় 'মুৎনিক'। একে বলে 'শব্দ-কৌতুক' (ইংরেজিতে 'পান'), 'স্পুতনিক' ও 'মুৎনিক' - শব্দ দুটো ধ্বনিগতভাবে একই কিন্তু দুই শব্দের অর্থ ভিন্ন ভিন্ন। যা হোক, কুদরিয়াভকা, মুৎনিক ইত্যাদি বিবিধ নামের বদলে, শেষ পর্যন্ত কুকুরটি আন্তর্জাতিকভাবে 'লাইকা' পরিচিতি পায়। রুশ ভাষায়, সংকর জাতীয় লোমওয়ালা কুকুরকে 'লাইকা' বলা হয়।

লাইকার কোনো স্থায়ী বাসস্থান ছিল না, মস্কোর পথে ঘাটে সে ঘুরে বেড়াত, যখন যা পেতে খেত, মস্কোর হাড়মজ্জা জমাট করে দেওয়া ঠান্ডার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে টিকে থাকতে শিখেছে, যেখানে সুবিধে হতো ঘুমাত। অর্থাৎ জোড়াতালি দেওয়া খাপছাড়া জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত সে। আর হবেই বা না কেন? ছিল গৃহহীন, হোমলেস কুকুর। তার এই কঠোর জীবন ইতিহাস 'নভোচারিণী' হওয়ার চূড়ান্ত মানদণ্ড হিসেবে পরিগণিত হয়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা ধরে নেন যে - ক্ষুধা এবং তীব্র তাপমাত্রার রূঢ় নিষ্ঠুর কর্কশ পরিস্থিতিতে যে কুকুর টিকে থাকতে শিখেছে, সেরকম শিক্ষিত কুকুরই

নভোচারিণী হতে পারে। রকেট-প্রতিভা সের্গেই করোলিয়েভের তত্ত্বাবধানে রুশ বিজ্ঞানীরা তাই মস্কোর পথঘাট থেকে বেশ কয়েকটি গৃহহীন কুকুরকে ধরে সোজা নিয়ে আসেন মহাশূন্য-গবেষণাগারের দালানে। স্পুতনিক-২ মিশনের জন্য লাইকাসহ 'মুশকা' ও 'আলবিনা' নামক আরো দুটো কুকুরকে ট্রেনিং-এর জন্য নির্বাচিত করা হয়। তিন কুকুরের নিবিড়-ট্রেনিং শুরু হয়। যেমন : নভোযানের অত্যন্ত সীমিত পরিসরের মধ্যে থাকতে পারা শেখানোর জন্য তাদেরকে ক্রমশ ছোটো থেকে ছোটোতর খাঁচায় বন্দি করে রাখা, মহাশূন্য ভ্রমণকালে বিশেষভাবে তৈরি যে উচ্চ পুষ্টিকর জেলি জাতীয় প্রোটিন খাদ্য তাদেরকে খেতে হবে সেই খাদ্য খাওয়ার অভ্যাস সৃষ্টি করা, বা নভোযানের উৎক্ষেপণ কালে যে বিকট অপ্রীতিকর শব্দ এবং গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্বরণের প্রবৃদ্ধি যে তুলকালাম ঝাঁকুনির সৃষ্টি করে সেগুলোর সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য কুকুরদের মেশিনে বসিয়ে, সেগুলোর 'অনুকরণ' বা 'সিমিউলেশন' করা ইত্যাদি (মানুষ-নভোচারীকেও কিন্তু এইসব ট্রেনিং নিতে হয়)।

ট্রেনিং শেষ হয়। চূড়ান্ত নির্বাচনে স্পুতনিক-২ মিশনের জন্য লাইকা নির্বাচিত হয়। নরম ঠান্ডা মেজাজ তার এবং স্লিমও বটে, ওজন মাত্র প্রায় পাঁচ কিলোগ্রাম বা এগারো পাউন্ড, নির্বাচনে সে প্রথম হয়। লাইকার বয়স তখন তিন বছর, তার ট্রেনার ছিলেন ভ্লাদিমির ইয়াজদভ্স্কি, তার বর্ণনা অনুযায়ী ১৯৫৭ সালটি খুব গুরুত্বপূর্ণ।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিপুল বেগে মহাশূন্য-প্রতিযোগিতা চলছে। অক্টোবর মাসে স্পুতনিক-১ সফল হয়, মহাশূন্য-অভিযানে রুশরা বিজয়ী হয়। এই ১৯৫৭ সালে আবার 'অক্টোবর বিপ্লব' নামে পরিচিত রুশ-বিপ্লবের ৪০তম পূর্তিও বটে। মহাশূন্য অভিযানের পথিকৃত হওয়ার আনন্দে উল্লসিত তৎকালীন রুশ নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ অভিলাস ব্যক্ত করে বলেন যে ৪০তম পূর্তির বছরে আরেকটি সফল 'মহাবিশ্বীয় জমকালো প্রদর্শনী' দেখিয়ে বিশ্ববাসীকে আবাক করে দিলে কেমন হয়? আসলে লাইকাকে দিয়ে 'মহাবিশ্বীয় জমকালো প্রদর্শনী'র আয়োজন স্পুতনিক-১'এর প্রস্তুতি পর্ব থেকেই ছিল।

লাইকা এবং উপগ্রহ- দুই-ই তৈরি

স্পুতনিক-২ কে তার যাত্রীর উপযোগী করে বানানো হয়। মাত্র চার সপ্তাহের মধ্যে নভোযানের ভেতরে হরেক রকমের যন্ত্রপাতি বসানো হয়, যাতে ভ্রমণকালে লাইকা জীবিত থাকে। তাই যন্ত্রপাতির মধ্যে ছিল একটি 'অক্সিজেন জেনারেটর', যার কাজ ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নেওয়া, ছিল তাপমাত্রা সক্রিয়করণ ফ্যান এবং সাতদিনের খাদ্য বাবদ প্রচুর জেলাটিন টাইপের খাদ্য।

লাইকাকে তার বিচলন ও গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের সব সাজসরঞ্জাম ও চেইন বা শিকল দিয়ে এমনভাবে রেডি করা হয় যে নভোযানের ভেতরে ইচ্ছামতো উঠে দাঁড়াতে পারবে, বসতে পারবে, শুতে পারবে, পারবে না কেবল চারদিকে ঘুরে ও কিছুটা আয়েস করে নেওয়া। তাকে এবারে নভোযানের ভেতরে বসানো হয়, সেদিনটি ছিল ১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসের একত্রিশ তারিখ। সবশেষে, নভেম্বর মাসের তিন তারিখে খুব ভোর যাত্রী লাইকাসহ স্পুতনিক-২ উৎক্ষেপিত হয়। উৎক্ষেপণ পর্ব সমাপ্ত হতে না হতেই কিছু সমস্যা দেখা দেয়। যেমন : উৎক্ষেপণের আগ মুহূর্তে লাইকার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানির হার, যাকে বলা হয় 'হৃৎস্পন্দন', ছিল মিনিট প্রতি ১০৩, সেটি বেড়ে হয় ২৪০? শ্বাসক্রিয়া প্রায় চারগুণ বেড়ে গেছে! কি ভয়ংকর সব ঘটছে, নয় কি? আসলেও তাই তো। তাছাড়াও আরেকটি সংকটপূর্ণ মুহূর্তের অবতারণা হয় তখন যখন দেখা গেল যে 'ব্লক এ' কোরের কাজ ছিল স্পুতনিক-২-এর সামনের ছুঁচালো মোচার মতো অংশটিকে পৃথক করে দেওয়া, কিন্তু করেনি বা করতে ব্যর্থ হয়েছে। নভোযানের ভেতরের তাপমাত্রা বাড়তে থাকে, বাড়তে বাড়তে চল্লিশ সেলসিয়াসে বা একশ চার ফারেনহাইটে উঠে আসে। ফলে যদিও লাইকার হৃৎদপিণ্ডের ধুকপুকানি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছিল কিন্তু বেঁচে থাকার, বিশেষ করে নিদেনপক্ষে সাতদিন বেঁচে থাকার চান্স লাইকার ছিল না। খুব সম্ভব, উৎক্ষেপণের পরে, পাঁচ থেকে সাত ঘণ্টার মধ্যে লাইকার আত্মা আমাদের সৌরমণ্ডলের মায়া ছেড়ে চলে যায়।

যে যান্ত্রিক গোলযোগের কথা বললাম সেটি যদি না-ও ঘটত তবু কিন্তু লাইকা কোনোদিনই পৃথিবীতে ফিরে আসত না। কারণ নভোযানকে কক্ষপথ থেকে বের হয়ে

পৃথিবীমুখী ফিরে আসার, যাকে 'ডি-অরবিট' বলা হয়, প্রযুক্তিটি আমরা তখনো জানতাম না। অর্থাৎ লাইকার মহাশূন্য-ভ্রমণ ছিল 'ওয়ান-ওয়ে' ট্রিপ। 'ডি-অরবিট' প্রযুক্তি আমরা আয়ত্ত করি ষাটের দশকের শুরুতে। তাই লাইকা'কে এমনভাবে পাঠানো ঠিক হয়নি বলে – কেউ বা কখনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকেন, আক্কেলবিহীনতার কথা বলেন। তবে গৃহহীন তথা গৃহতাড়িত লাইকা'র জীবনের শেষ কয়েকটি দিনের চমৎকার স্মৃতি লাইকার জীবনেও নিশ্চয় নিটোল সুন্দর ছাপ রেখেছিল। ট্রেনিংকালে শিক্ষক ইয়াজদভ্স্কি তো বটেই অন্যান্য মানুষরা কত আদরযত্ন করেছে তার, কোলে নিয়ে ঘুরেছে, অভয় বাণী শুনিয়েছে; নভোযানে বসবার আগের দিনটা কেটেছে এক বিজ্ঞানীর বাসায়, তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করে।

লাইকার পূর্বে ও পরে যেসব প্রাণী মহাশূন্যে গিয়েছিল, তাদের মধ্যেও কয়েকজন আর ঘরে ফিরে আসেনি, মারা গেছে। আসলে হয়ত মানুষের মতো প্রাণীকুলেরও, মৃত্যুকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল কারো হাতে নেই। ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে লাইকাকে বহনকারী স্পুতনিক-২ বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতন স্তরে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সঙ্গে মহৎ কাজে আত্মোৎর্সগকারী লাইকার মৃতদেহটিও। তা সত্ত্বেও কিন্তু মহাশূন্য অভিযানে বিপ্লব ঘটে যায়। শুরু হয় মহাশূন্য অভিযানের নতুন আরেক অধ্যায়ের।

শেষ জীবনে লাইকা সারাজীবনে না পাওয়া ভালোবাসা, সম্মান সব পেয়েছে এবং সে মরে গেলেও, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে আমাদের মধ্যে বেঁচে আছে। কারণ লাইকা-ই মানুষের মহাশূন্য অভিযানের পথকে সহজসাধ্য করে দিয়েছে। আমরা লাইকার কাছে ঋণী।

লাইকার সঙ্গে মুশকা ও আলবিনা নামের আরো যে দুটো গৃহহীন কুকুর ট্রেনিং নিয়েছিল, তাদের মধ্যে আলবিনা ছিল লাইকার 'ব্যাকআপ' কুকুর এবং মুশকা ছিল 'নিয়ন্ত্রণ' কুকুর। পরে তারাও মহাশূন্য ভ্রমণ করেছিল। তবে দুজনকে পৃথক পৃথক মিশনে পাঠানো হয়েছিল। যেমন : 'প্চেলকা'(ছোট্ট মৌমাছি)র সঙ্গে 'মুশকা'কে (ছোট্ট মাছি) স্পুতনিক-৬'এর করে মহাশূন্যে পাঠানো হয় ১৯৬০ সালের পহেলা ডিসেম্বর। সঙ্গে ইঁদুর, পোকামাকড় ও নানা জাতের উদ্ভিদও পাঠানো হয়। কিন্তু ফিরতি পথে পুর্নপ্রত্যার্বতনের সময় নভোযানে আগুন লেগে যায়। ক্যাপস্যুলসহ সবাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে, 'মুশকা'ও চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। আলবিনা'ও মহাশূন্যে যায়, সঙ্গে ছিল 'তসিগানকা' (জিপসি মেয়ে)। তারা অবশ্য পৃথিবী থেকে চুরাশি কিলোমিটার উপরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং সাফল্যের সঙ্গে ক্যাপসুল থেকে বের হয়ে আসে এবং প্যারাস্যুটের সাহায্যে পৃথিবীতে নিরাপদ অবতরণ করে।

লাইকার দুই বান্ধবী- আলবিনা ও মুশকা

যাহোক, লাইকা, মুশকা ও আলবিনা - এরা তিনজন একসঙ্গে ট্রেনিং পেয়েছে, তিনজনই মহাশূন্যে গেছে এবং তিনজনের মধ্য থেকে মাত্র একজনই ঘরে ফিরে আসে। তবে, মানুষের মহাশূন্য ভ্রমণের প্রস্তুতিতে তিনজনের অবদান কমবেশির মাপকাঠিতে ভাগাভাগি করে মাপা সম্ভব নয়। তিনজনের অবদানই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

এরপরে, আরো কয়েক দফায় রুশরা আরো কয়েকটি কুকুরকে মহাশূন্য/মহাবিশ্ব ভ্রমণে পাঠিয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পোকামাকড়, বাঁদর, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদিকে দূরালোকে পাঠিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আসার আগে মহাশূন্য/মহাবিশ্ব কী অথবা কোথায় কখন তার শুরু - সে বিষয়ে সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাক।

মহাবিশ্বের শুরু কোথায়-কারম্যান লাইন

আমাদের পৃথিবীকে চারদিক থেকে 'বায়ুমণ্ডল' আগাপাশতলা জড়িয়ে রেখেছে। বায়ুমণ্ডলটি পাঁচটি প্রধান স্তরে বিভক্ত। পৃথিবীর সমুদ্রের উপরিভাগ থেকে শুরু করলে স্তরগুলো একটির উপরে আরেকটি করে সাজানো এভাবে : ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার, মেজোস্ফিয়ার, থার্মোস্ফিয়ার এবং ইকসোস্ফিয়ার। আমরা যতই উপরের দিকে এক একটি স্তরে যেতে থাকব - স্তরগুলোতে গ্যাসের পরিমাণ ক্রমশ পাতলা হতে থাকবে তো থাকবেই এবং অবশেষে হাজির হবো প্রায় গ্যাসশূন্য মহাশূন্যে। আমরা বলতে পারি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমানা যেখানে শেষ হচ্ছে, সেখান থেকে শুরু হচ্ছে মহাশূন্যের/ মহাবিশ্বের। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে বায়ুমণ্ডল এবং মহাশূন্য/ মহাবিশ্বের মধ্যে সুস্পষ্ট কোনো সীমারেখা নেই বা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে সমস্যার সমাধান হিসেবে বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে পৃথিবীর ঊর্ধ্বে - মোটামুটি আটষট্টি মাইল বা একশ দশ কিলোমিটার উপরে বায়ুমণ্ডল - মহাশূন্য/মহাবিশ্বের মুখোমুখি হচ্ছে। এই মিলনবিন্দুকে 'কারম্যান লাইন' নামক কাল্পনিক রেখা দিয়ে শনাক্ত করা হয়। (বিষুব রেখা, দ্রাঘিমা রেখা, দ্রাঘিমাংশ, অক্ষাংশ ইত্যাদি বিবিধ কাল্পনিক রেখার মতো এটিও একটি কাল্পনিক রেখা)। আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে কারম্যান লাইন থেকে মহাবিশ্বের সূচনা হচ্ছে।

এই কাল্পনিক লাইনটির নাম হয়েছে পদার্থবিদ থিয়োডর ফন কারম্যানের নামানুসারে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বিষয়ে তিনিই প্রথম বিস্তৃত গবেষণা করেন। তদুপরি মহাশূন্য অভিযানে 'অ্যারোনটিক্স' ও 'অ্যাস্ট্রোনটিক্স' নামক যে দুটো বিষয় না হলে চলে না - ফন কারম্যান সেগুলোর উপরও প্রচুর কাজ করেন।

পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের স্তরটি হলো ট্রপোস্ফিয়ার। পৃথিবীর উপরে - চার থেকে বারো মাইল বা সাত থেকে কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত এর বিস্তার এবং

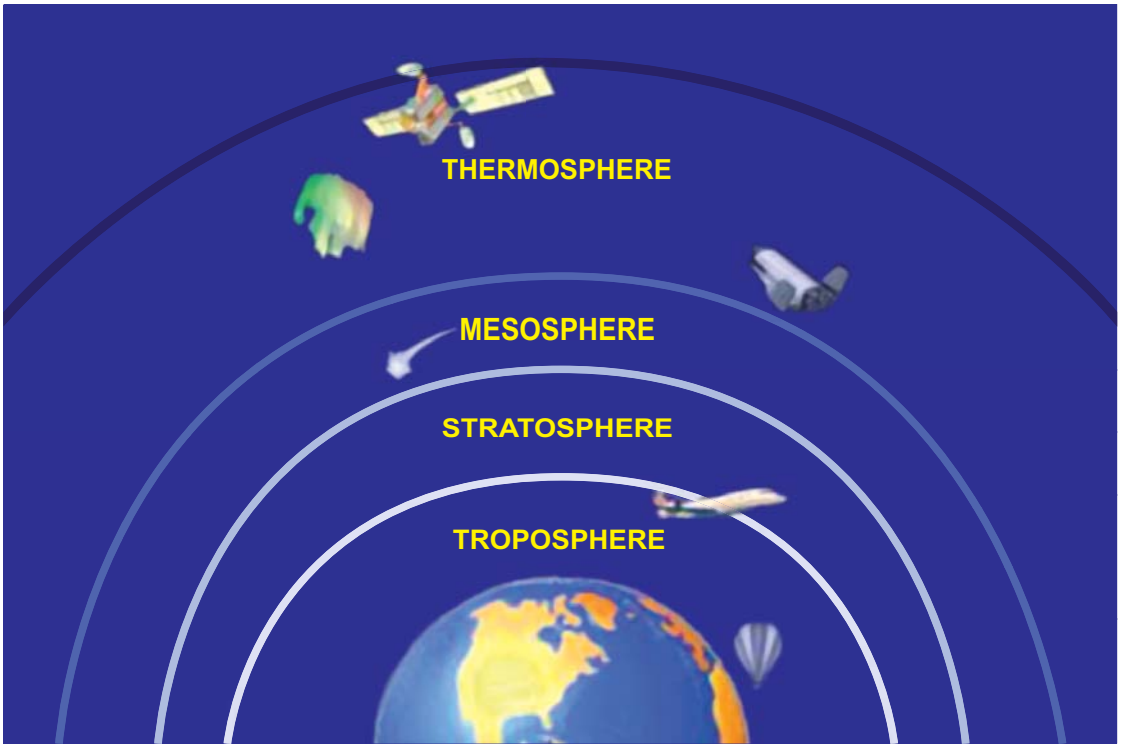

বায়ুমণ্ডলের অর্ধেকটা পরিমাণ এখানে বিরাজ করছে। সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলে যতটুকু জলীয় বাষ্প ও ধূলিকণা রয়েছে, সেগুলোর প্রায় সবটুকুই এই স্তরে বিদ্যমান। আর এই কারণেই আকাশে আমরা মেঘ দেখি। ট্রপোস্ফিয়ারের পরের স্তরটি স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। জমি থেকে উপরে একত্রিশ মাইল বা পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে রয়েছে প্রচুর অঢেল ওজন, বায়ুমণ্ডলকে যা উত্তপ্ত করে এবং সূর্য থেকে আগত ক্ষতিকর সব রশ্মিকে শুষে নেয়। এখানকার বাতাস খুবই শুকনো এবং পৃথিবীর জলভাগের বায়ুর তুলনায় প্রায় এক হাজার গুণ পাতলা। আর এই কারণেই সব জেট প্লেন ও আবহাওয়া-বেলুন এই স্তরটিতে ওড়াউড়ি করে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের তৃতীয় স্তর মেজোস্ফিয়ার। তার শুরু একত্রিশ মাইল বা পঞ্চাশ কিলোমিটার থেকে এবং উপরের দিকে তিপ্পান্ন মাইল বা পঁচাশি কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। মেজোস্ফিয়ারের একেবারে উপরের অংশকে বলা হয় 'মেজোপজ' - এটিই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শীতলতম অংশ, এখানে তাপমাত্রা মাইনাস একশ ত্রিশ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা মাইনাস নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভাবা যায় যে মাত্র কয়েক কিলোমিটার বা কয়েক মাইল উপরে গেলেই এত ঠান্ডা? এই স্তরটি নিয়ে গবেষণা করা বেশ ঝামেলার। কারণ, জেট বিমান বা বেলুন এত উপরে ওঠে না, আবার কৃত্রিম উপগ্রহ এবং নভোযানগুলোর কক্ষপথ আরো উপরে। ফলে, কে সংগ্রহ করবে গবেষণার উপাত্ত! কেউ তো নেই। তবে জানি যে উল্কাপিণ্ডগুলো এখানেই পুড়ে ছাই হয়।

চর্তুথ স্তর হলো থার্মোস্ফিয়ার। ছাপ্পান্ন মাইল বা নব্বই কিলোমিটার থেকে সে উপরের দিকে চলে গেছে এবং উপরের স্তরটি তিনশ দশ ও ছয়শ বিশ মাইলের মধ্যে বা পাঁচশ এবং একহাজার কিলোমিটার পরিমাণ জায়গা জুড়ে অবস্থান করছে। নামেই বোঝা যায় যে এখানে তাপমাত্রার পরিমাণ বেশি হতে বাধ্য। তাপমাত্রার পরিমাণ দুই হাজার সাতশ ডিগ্রি ফারেনহাইট বা একহাজার পাঁচশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে। থার্মোস্ফিয়ারকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অংশ হিসেবে বিবেচনা করলে হবে কী, বাস্তবে নভোযান এবং আন্তর্জাতিক মহাশূন্য গবেষণাগার কিন্তু এই স্তরেই অবস্থান নিয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এখানেই চোখ জুড়ানো, মনোমুগ্ধকর মেরুজ্যোতির সৃষ্টি হয়, যাকে আমরা সুমেরু ও কুমেরু ভেদে যথাক্রমে বলি উদীচি উষা ও অবাচী উষা। স্তরটিতে বিদ্যমান পরমাণু ও অণুর সঙ্গে মহাশূন্যের চার্জযুক্ত কণিকাগুলো সংঘর্ষ ঘটিয়ে ঘটিয়ে সৃষ্টি করে অবিস্ময়কর মনোহর আলোকচ্ছটার।

তথাকথিত সর্বশেষ স্তর যে একমোফিয়ায় - নামেই বোঝা যায়। এখানেই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বহির্বিশ্বের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে বায়ুমণ্ডল নামক সত্তার অস্তিত্ব হারায়। স্তরটি খুব পাতলা, এবং বিরাট/বিশাল জায়গা জুড়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের কণিকারা। অর্থাৎ থার্মোস্ফিয়ারের মাঝামাঝি কোথাও থেকে মহাশূন্য/মহাবিশ্বের শুরু।

সবশেষে, আমরা কিন্তু খুব সহজেই বলতে পারি ভাগ্যিস বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে। কারণ সে যদি না থাকত পৃথিবীর উপরিভাগের তাপমাত্রা অসহনীয় রকমের বেশি হতো। বিনা বাধায় মহাক্ষতিকর অতি-বেগুনি রশ্মি পৃথিবীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত এবং প্রাণিজগতের বিশাল অংশকে সে নির্দয়ের মতো মেরে ফেলত। আর উল্কাপিণ্ডগুলো জ্বলেপুড়ে ছাই না হয়ে সরাসরি পৃথিবীর বুকে আঘাত করত, তৈরি হতো নানা মাপের গর্ত। বায়ুমণ্ডল নেই বলে বৃষ্টিপাতও হতো না - চারদিক জুড়ে থাকত খাঁ-খাঁ মরুভূমি, কোনো প্রাণের চিহ্নমাত্র থাকত না, ঠিক চাঁদে যেমনটি দেখি।

মহাবিশ্বে - কুকুর এবং অন্যান্য প্রাণীদের কেন পাঠানো হলো?

ধরো, মহাবিশ্বে মানুষকে পাঠাতে চাইছ, কিন্তু সেখানে কেউ যায়নি তখনো, তাই একেবারেই অজানা সেই মহাবিশ্ব। এমন পরিস্থিতিতে কী করবে - তুমি, আমি, অন্য যে কেউ? মহাবিশ্বের ওজনহীন পরিবেশ আমাদের শরীরের ওপরে কেমন প্রভাব ফেলবে? রয়েছে মারাত্মক ক্ষতিকর বিকিরণের প্রভাব, শারীরিক চাপ ইত্যাদি? কেউ কি এসব প্রশ্নের উত্তর জানে? কেউ জানে না। মহাবিশ্বের এমন অ-বন্ধুসুলভ প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকার জন্য নিশ্চয়ই দরকার হবে বিশেষ 'লাইফ-সার্পোট পদ্ধতির'? কিন্তু সেটির পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে কীভাবে? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে, ১৯৫০-এর দশকে রুশরা সিদ্ধান্ত নেয় মহাশূন্যে প্রাণী পাঠানো হবে, বিশেষ করে পাঠানো হবে কুকুর। কুকুর কেন? কারণ কী? কারণ, সাইজে ছোটো বলে নভোযানের ক্যাপসুলে সহজে একে বসিয়ে, শুইয়ে আরামসে

লাইকা একটি রকেটের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে

মনিটর করা যাবে। যেমন ভাবা তেমনি কাজ, ষাট বছর আগে, স্পুতনিক-১-এর সফল উৎক্ষেপণের প্রায় মাসখানেক বাদে - নভেম্বর মাসের তিন তারিখে 'লাইকা'কে স্পুতনিক-২ -এ মহাবিশ্বে পাঠানো হয়। অর্থাৎ ষাট বছর আগে। অপরদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও মহাবিশ্বে প্রাণী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়, তারা বেছে নেয় বিশেষ করে - বাঁদর ও শিম্পাঞ্জি।

এই প্রসঙ্গে তাই লাইকার অবদানের কথা বলতে হয়। লাইকাসমেত স্পুতনিক-২ প্রতি ১০৩.৭ মিনিটে আমাদের পৃথিবীর চারদিকে একবার করে ঘুরেছে এবং এই প্রদক্ষিণকালে আমাদের পৃথিবী থেকে তার দূরতম অবস্থান বা শীর্ষবিন্দু ছিল ১,০৩৮ মাইল (অ্যাপজী) এবং পৃথিবীর নিকটতম বিন্দুতে (পেরিজী) যখন চলে আসত তখন তার দূরত্ব হত মাত্র ১৪০ মাইল। লাইকা যে কম্পার্টমেন্টে ছিল, - সেখানে ছিল - মহাজাগতিক রশ্মি, সৌর অতিবেগুনি রশ্মি ও এক্স-রে, তাপমাত্রা এবং চাপ মাপজোকের জন্য নানা রকমের যন্ত্রপাতি। স্পুতনিক-২ যদিও মাত্র সাতদিন ধরে উপাত্ত পাঠায়, তবে প্রাণী-জীবনের ওপরে মহাবিশ্বীয় প্রভাব এবং বায়ুমণ্ডলের ঘনত্ব এবং পৃথিবীর আকৃতির প্রভাব সম্বন্ধে বিজ্ঞানী সমাজ প্রথমবারের মতো সুস্পষ্ট একটি ধারণা পান।

সাতদিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে, উপাত্ত পাঠাতে অক্ষম হলেও স্পুতনিক-২ একশ বাষট্টি দিন মহাশূন্যে থেকে যায়, অবশেষে ১৯৫৮ সালের ১৪ইএপ্রিল বায়ুমণ্ডলে প্রবেশকালে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সঙ্গে ইত্যবসরে মৃত লাইকা-ও। লাইকা আসলে মহাবিশ্ব ভ্রমণকারী প্রথম প্রাণী ছিল না। পরবর্তী অংশে এ প্রসঙ্গে আসব। লাইকা তবু এত খ্যাতিমান হয় কেন? কিন্তু হবেই বা না কেন? স্পুতনিক-২ যেসব উপাত্ত পাঠায়, ছিল তো অভূতপূর্ব, তুলনাহীন, এবং লাইকা যদি বেঁচে থাকত তো হতো সোনায় সোহাগা। অপরিসীম অবদানের জন্য তাকে যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সর্বশেষ, ২০০৮ সালে লাইকা'র নামে মনুমেন্টও তৈরি হয় : 'লাইকা, প্রথম কুকুর যে মহাশূন্যে যায়।' মস্কোর যে সামরিক গবেষণা কেন্দ্র লাইকার মহাশূন্য ভ্রমণের ব্যবস্থাদি নিয়েছিল, সেই কেন্দ্রটির কাছে লাইকা-মনুমেন্ট স্থাপিত হয়েছে।

প্রথম প্রাণী-নভোচারিণী

প্রথম প্রাণী নভচারিণী ছিল কে বা কারা? ছিল ফলের মাছি (ফ্রুট-ফ্লাইজ)। ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি

রিসার্চ বাঁদর

সেদিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানিরা একটি বাক্সের মধ্যে কয়েকটি ফলের মাছিকে বাক্সবন্দি করে ভি-২ রকেটের মধ্যে বসিয়ে দেন, রকেটটিকে উপরের দিকে উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণকালে রকেট প্রতিভা ভার্ণার ফন ব্রাউনও উপস্থিত ছিলেন। থাকবেন তো বটেই, ভি-২ রকেটটি যে তারই আবিষ্কার। ছিল তো পৃথিবীর প্রথম দূর-পাল্লার গাইডেড ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে রকেটটি প্রথম ব্যবহার হয়। সে যা হোক, ভি-২ যেহেতু দূর পাল্লার গাইডেড ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, তাই উৎক্ষেপণের পরপরই মাত্র তিন মিনিট দশ সেকেন্ডের মধ্যে - ফলের মাছিসমেত আটষট্টি মাইল বা একশ দশ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে এবং কারম্যান লাইন র্পযন্ত চলে আসে! ভাবা যায়? ফলের মাছির কেমন কপাল!

মহাশূন্যে প্রথম যে স্তন্যপায়ী প্রাণীকে পাঠানো হয়, অ্যালর্বাট-২ নামক একটি রিসাস-বাঁদর, ১৯৪৯ সালের ১৪ই জুন যুক্তরাষ্ট্র পাঠিয়েছিল। অ্যালর্বাট'কে অ্যানেসথেসিয়া দিয়ে অজ্ঞান করে একটি বাক্সের মধ্যে আটকে রকেটের মধ্যে স্থাপন করা হয়েছিল, তাকে মনিটর করার জন্য দরকারি সংযোগও যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু ফিরতি পথে বায়ুমণ্ডলে পুর্নপ্রত্যাবর্তনকালে (রি-এন্ট্রি) সৃষ্ট প্রবল সংঘর্ষে অ্যালবার্ট-২ মারা যায়।

আমরা দেখছি যে মহাশূন্য-অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র যখন নানা শ্রেণির বাঁদর নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা রুশরা প্রাধান্য দিচ্ছে কুকুরের উপরে। ১৯৫০ ও ১৯৬০-এ দশকে রুশদের সংগ্রহে ছিল পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানো সাতান্নটি গৃহহীন কুকুর এবং সবগুলোই ছিল মাদি-কুকুর। অবশ্য সবগুলোরই যে মহাশূন্য ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা নয় কিন্তু। কারণ, কোনো কোনো কুকুরকে একাধিকবার মহাশূন্য অ্যাডভেঞ্চারে পাঠানো হয়েছিল।

রুশরা 'ত্সিগানকা' (জিপসি মেয়ে) ও 'দেজিক' নামক একজোড়া কুকুরকে জ-১ IIIA-১ রকেটের সাহায্যে প্রথম মহাশূন্যে পাঠায় ১৯৫১ সালের ২২শে জুলাই। কুকুর দুটো মহাশূন্যে যায় বটে কিন্তু পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে না। তবে জীবন্ত ফিরে আসে পৃথিবীতে, এবং 'ত্সিগানকা' (জিপসি মেয়ে) ও 'দেজিক' প্রথম সফল স্তন্যপায়ী নভোচারীর টাইটেল অর্জন করে।

লাইকা'র পরে সোভিয়েতরা 'বিয়েলকা'(কাঠবিড়ালি) ও

বা দিক থেকে : বিয়েলকা ও স্ত্রেলকা

'স্ত্রেলকা'(ছোট্ট তীর) নামক আরো একজোড়া কুকুরকে মহাশূন্যে পাঠায়, সঙ্গে থাকে চল্লিশটি ইঁদুর, দুটো ধেড়ে ইঁদুর, এবং নানা জাতের উদ্ভিদ। ১৯৬০ সালের ১৯শে আগস্ট ওদের পাঠানো হয় স্পুতনিক-৫'এ। 'বিয়েলকা' ও 'স্ত্রেলকা' মহানন্দে পৃথিবীকে আঠারো বার প্রদক্ষিণও করে, একই সঙ্গে ছিল দূর মহাশূন্যে - নিজ কক্ষপথে থেকে পৃথিবীর প্রাণীর পৃথিবীকে প্রথম প্রদক্ষিণ করার মুহূর্ত! (একে কক্ষপথীয়/ অরবিটাল পরিক্রমণ বলা হয়)। এভাবে মহাশূন্য অভিযানের আরেকটি সফল রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটে গেল।

মহাশূন্য ভ্রমণ ফেরত স্ত্রেলকা ছয়টি কুকুর ছানার জন্ম দেয়। রুশ-মার্কিন সম্পর্কে তখন খুব টেনশন চলছিল বটে, ঠান্ডা যুদ্ধের টানাপোড়েনের সব উত্তাপকে বাদ দিয়ে কিন্তু রুশ প্রধান নিকিতা ক্রুশ্চেভ 'স্ত্রেলকা'র 'পুশিংকা' নামক ছানাটিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন. এফ. কেনেডির শিশু কন্যা কেরোলাইন কেনেডি'কে উপহার দেন। পরে, হোয়াইট হাউসে 'পুশিংকা'র ঘরেও চারটি কুকুর ছানা জন্মায়। প্রেসিডেন্ট কেনেডি শব্দ কৌতুক করে ডাকতেন 'পুপনিকস'।

প্রাণী-নভোচারীর আমাদের মহাবিশ্ব অভিযানকে সম্ভব করে সশরীরে মানুষের মহাবিশ্ব-অভিযানের অ্যাডভেঞ্চারকে বাস্তবায়িত করার বিরাট এক ভূমিকা পালন করে। এককালে মস্কোর পথেঘাটে ঘুরে বেড়ানো কুকুররা এবং নানা শ্রেণির বাঁদর ও

শিম্পাঞ্জি। কখনো-বা ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর, গিনিপিগ, নানা জাতের উদ্ভিদ ইত্যাদিরা মহাশূন্যে তাদেরকে সঙ্গ দিয়েছে। প্রাণিজগতের এসব সদস্যের ভূমিকা বলে শেষ করবার নয়। তা সত্ত্বেও তাদের দুঃসাহসের সামান্য কয়েকটি ঘটনা বলছি।

যেমন : গর্ডো ছিল স্কুইরেল বাঁদর। ১৯৫৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর সে পৃথিবীর উর্ধ্বে ছয়শ মাইল পর্যন্ত গিয়েছিল। ফিরতি পথে, জলে অবতরণের সময় জলে ভাসিয়ে রাখার যন্ত্রটি কাজ করেনি বলে মারা যায়। তীরে এসে নৌকাডুবি আর কী।

আবার, অ্যাবল নামক এক রিসাস বাঁদর এবং বেকার নামক স্কুইরেল বাঁদরকে - ১৯৫৯ সালের ২৮শে মে, যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে এক সঙ্গে মহাশূন্যে পাঠায়। বাঁদর দুটো তিনশ মাইল উপরে ওঠে, তারপরে নিরাপদে ফিরেও আসে। অপারেশন করে শরীর থেকে ইলেক্ট্রোড বের করবার সময় অ্যাবল মারা যায় এবং বেকার মারা যায় সাতাশ বছর বয়সে ১৯৮৪ সালে কিডনির অসুখে।

১৯৬১ সালের ৩০শে জানুয়ারি হ্যাম'কে পাঠানো হয় মহাবিশ্বে। হ্যামের 'হ্যাম' নাম হয় 'হলোম্যান অ্যারোস্পেস মেডিক্যাল সেন্টারে'র প্রথম তিনটি শব্দের প্রথম অক্ষরগুলো নিয়ে। হ্যাম ছিল ট্রেনিং পাওয়া তীক্ষ্ণ শিম্পাঞ্জি। যেমন : বৈদ্যুতিক শক বাঁচিয়ে হাতল ঘুরিয়ে খুপরি খুলে কলা নেওয়ার কৌশল তার রপ্ত ছিল। হ্যামের বাহাদুরি যে হাতল ঘোরানো থেকে নভোযানের বিভিন্ন জিনিস নাড়াচাড়া করে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। মহাশূন্য ফেরত হ্যামের জীবনের বাকি সতেরোটি বছর কেটেছে ওয়াশিংটনের জাতীয় চিড়িয়াখানায়।

কুকুর ও বাঁদরের ভিড়ে ফরাসি বিজ্ঞানিরা ১৯৬৩ সালের ১৮ই অক্টোবর ফেলিসেট - ডাকনাম অ্যাস্ট্রো-ক্যাট'নামে পরিচিত বিড়ালকে মহাবিশ্বে পাঠান, এবং সাফল্যের সঙ্গে 'প্যারাস্যুট অবতরণের' সাহায্যে ফিরিয়ে আনেন। ফেলিসেটের অহংকার যে তার আগে এবং পরে আর কোনো বিড়াল মহাশূন্য ভ্রমণে যায়নি।

'ভিয়েতেরক' (মৃদুমন্দ বায়ু) ও 'উগোলিয়োক' (কয়লা) নামের দুই কুকুরের কথা না বললেই নয়। এরা এক সঙ্গে মহাবিশ্বে যায় ১৯৬৬ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি, সেখানে এক নাগারে বাইশটি দিন কাটানোর পরে ঘরে ফিরে আসে। ভাবা যায়? ১৯৭৪ সালের আগ পর্যন্ত ভিয়েতেরেক ও উগোলিয়োক তাদের রেকর্ডটি অক্ষুণ্ন রাখে।

'ভিয়েতেরক' (মৃদুমন্দ বায়ু) ও 'উগোলিয়োক' (কয়লা)

প্রাণী-নভোচারিণীরা পৃথিবীর প্রথম মানুষের প্রথ মবারের মতো মহাবিশ্ব-ভ্রমণের সমস্যা সমাধান করে দেয়। তাদের 'হোমওর্য়াক' যা ছিল - সেগুলো তারা ঠিকঠাক মতো করে বলেই ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসের ১২ তারিখে ইউরি গাগারিন মহাশূন্যে

নভোচারী হ্যাম

ঢুঁ মেরে আসতে সক্ষম হন। সর্বশেষে, গাগারিনের মহাশূন্যে পাড়ি দেওয়ার পূর্বে - মার্চ মাসে পর পর দুই দফায় সর্বশেষ 'রিহার্সেল' মিশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম রিহার্সেলটি হয় ১৯৬১ সালের ৯ই মার্চ। 'স্পুতনিক-৯' 'চেরনুশকা' (কৃষ্ণা/কালী) নামক কুকুরকে পাঠানো হয়, সঙ্গি হিসেবে দেওয়া হয় 'ইভান ইভানোভিচ' নামের একটি 'নকল/ডামি' নভোচারীর মূর্তিকে, কয়েকটি ইঁদুর ও একটি গিনিপিগকে। চেরনুশকার কাজ ছিল কক্ষপথে একবার ঘুরে পৃথিবীতে ফিরে আসা। ফিরতি পথে, 'রি-এন্ট্রি বা বায়ুমণ্ডলে প্রত্যার্বতনের' সময় 'নকল নভোচারীটি' নভোযানের ক্যাপসুল থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারাস্যুটের সাহায্যে বেরিয়ে আসে এবং আলতো ভাবে অবতরণ করে। চেরনুশকা ক্যাপস্যুলেই থাকে, পৃথিবীতে অবতরণের পরে তাকে অক্ষত অবস্থায় ক্যাপস্যুল থেকে উদ্ধার করা হয়।

দ্বিতীয় রিহার্সেলটি হয় পঁচিশে মার্চ, যে কুকুরটিকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়, গাগারিন ওর নাম দেন 'জোয়েজদচকা" (ছোট্ট তারকা/নক্ষত্র)। 'জোয়েজদচকা'র সঙ্গেও একটি নকল/ডামি নভোচারীকে দেয়া হয়। এক্ষেত্রেও নকল নভোচারী প্রত্যার্বতনের সময় প্যারাস্যুটের সাহায্যে আলতো অবতরণ করে, 'জোয়েজদচকা'কেও অক্ষত অবস্থায় সাফল্যের সঙ্গে ক্যাপস্যুল থেকে উদ্ধার করা হয়।

গাগারিনের মাধ্যমে মানুষের প্রথম সফল মহাশূন্য ভ্রমণ–মহাশূন্য অভিযানের নতুন আরেক অধ্যায়ের সূচনা করে। (গাগারিনের কাহিনি পরে কখনো বলা যাবে।)। এরপর থেকে, মহাবিশ্ব অভিযান ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে সেই সঙ্গে প্রাণি-জগতের সদস্যদের ভূমিকাও মৌলিকভাবে বদলে যায়। এই কাহিনি পৃথকভাবে পরে কখনো বলব।

লাইকার মহাশূন্য ভ্রমণের ষাটতম পূর্তিতে - লাইকাসহ প্রাণিজগতের সব বীর নভোচারিণী/নভোচারীদের আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এদের সবার নাম পরিচয় সীমিত পরিসরের এই প্রতিবেদনে বলা হয়নি।

সরকার লাবিব আল ইমরান, ষষ্ঠ শ্রেণি, মতিঝিল মডেল হাই স্কুল, ঢাকা

রাইসা নুজহাত জামান, দ্বিতীয় শ্রেণি, ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

গাছ বিজ্ঞানী

জান্নাতুল ফেরদৌস আইভি

সবুজের নাম ওর বাবা-মা কেন সবুজ রেখেছেন ও জানেনা। তবে ওর গাছ লাগানোর আর গাছের যত্ন নেওয়ার ইচ্ছে দেখে স্কুলের বন্ধুরা আর শিক্ষকেরা সবাই ওকে যখন বলে যে, এজন্য তোমার নাম সবুজ– এটা শুনলে ওর অনেক আনন্দ হয়। ক্লাসে সেদিন একজন নতুন শিক্ষক এসেছিলেন, ওদের বিন্দু ম্যাডাম সেদিন ক্লাসে আসেননি বলে ওদের ক্লাসে ঐ নতুন ম্যাডাম এসেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তোমরা বড়ো হয়ে কে কি হতে চাও? ওর বন্ধুরা অনেকে বলল, ডাক্তার হতে চায়, ডাক্তার হলে মানুষের সেবা করা যায়, অনেকে বলল, ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, তাহলে দেশের উন্নয়নের জন্য সরাসরি কাজ করা যায়। কেউ বলল– গায়ক হতে চায়, কেউ বলল– লেখক হতে চায়। যখন সবুজের বলার পালা আসলো ও বলল– ও গাছের ডাক্তার হতে চায়। এটা শুনে ওর সব বন্ধুরা প্রথমে হেসেই কুটিকুটি। কিন্তু ওদের সেই নতুন শিক্ষক আবার প্রশ্ন করলেন কেন তুমি গাছের ডাক্তার হতে চাও?

সবুজ ওর বন্ধুদের হাসির কারণে খুব মন খারাপ করে বলল, 'মিস আমার যখন হাত-পা কেটে যায়, আমার, আম্মু অথবা আব্বু আমার হাত-পা-এর ব্যথা দূর করে দেওয়ার জন্য কাটা জায়গাটা পরিষ্কার করে দিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দেয়। পরদিন সকালে ব্যথা সেরে যায় বলে আমি আবার স্কুলে আসতে পারি। বিভিন্ন কারণে আমাদের শহরের অনেক গাছের ডাল কেটে ফেলা হয়। যেমন– ইলেক্ট্রিক তারের সঙ্গে যেন পেচিয়ে না যায়, কোনো রাস্তার উপর গাছের ডাল ঝুঁকে না পড়ে তার জন্যে, কোনো উৎসবের সময়ে গাছের ডালে আলোক সজ্জা করতে গিয়ে এমন আরও অনেক কারণে আমরা গাছকে ব্যথা দেই। কিন্তু ওদের কোনো ব্যথা নিয়ে কেউ ভাবে না। তাছাড়া আমাদের বাসার টবে যে গাছ আছে ওখানে মাঝে মাঝে ছোটো ছোটো বিভিন্ন পোকা হয় বলে দাদু সেসব গাছ কেটে ফেলেন।

দাদু বলেন যে, গাছের ফাংগাস সেটা। তখন আমার খুব মন খারাপ হয় যে গাছটার চিকিৎসা করতে পারলে ঐ পোকা চলে যেত, ওকে কেটে ফেলতে হতো না। এইজন্য আমি চাই বড়ো হয়ে আমি গাছের ডাক্তার হব, আমি গাছদের চিকিৎসা করে আরো অনেক বেশি দিন ওদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই। এরপর ওদের সেই শিক্ষক সবার জন্য বললেন, সবুজ যে কথাটা বলেছে তার জন্যে আমরা সবাই ওকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাই। গাছ আমাদের জীবনের সবচেয়ে উপকারী বন্ধু। সেই উপকারী বন্ধুর জন্য আমরা খুব কম মানুষ ভাবি। ও যে ভেবেছে, এটাতে আমরা সবাই আনন্দিত বোধ করছি।

এর কয়েক দিন পর সবুজের আম্মু তাঁর অফিসের একটি আলোচনার জন্যে শ্রীলংকা যায়। সবুজের আম্মু শ্রীলংকার চিলো অঞ্চলে গিয়ে সমুদ্রের পাড়ের একটা রিসোর্টে ছিল। সেই এলাকাটা এত সুন্দর যে ভিডিও কল করে সবুজের বাবা, সবুজ আর ওর দাদুকে দেখিয়েছে। সেখানে ঐ আবাসিক বাড়িটার থেকে সকালের সূর্যোদয় আবার সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত দেখা যায়। আম্মু ওকে সূর্যাস্ত দেখিয়েছে কিন্তু সূর্যোদয়ের সময় সবুজ ঘুমিয়ে ছিল বলে ওর বাবা ওকে ডেকে দেখায়নি শুধু দাদুকে দেখিয়েছে। সেই গল্প দাদু দুপুরে ও স্কুল থেকে ফিরলে তখন বলেছে। ও তখন ওর আম্মুকে মেসেজ পাঠিয়ে রাখে যে, পরের দিন সকালে সূর্যোদয়ের সময়ের কয়েকটা ছবি তুলে যেন ওকে পাঠায়। সবুজের ম্যাসেজ পেয়ে ওর আম্মু দুপুরের ঝকঝকে রোদের আলোতে শ্রীলংকার ঘন জঙ্গল সদৃশ গাছের অনেক ছবি তুলে ওর দাদুর মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দেয়। সেসব ছবি দেখে সবুজ খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়। ও দেখছে, সেই ছবিগুলোতে একটা গাছ আছে যেটা দেখতে আমাদের দেশের চারা আম গাছের মতো, সেখানে অবিকল আমের আকৃতির ফলও ঝুলে আছে। সবুজের আম্মু আবার বলে দিয়েছে ঐ ছবির নিচে লিখে যে তুমি কিন্তু এটাকে আম মনে করে খেতে চাইবে না, এটি আসলে আম গাছ না। এটা একই সঙ্গে আমের মতো দেখতে একটা গাছ আবার এর ফুলগুলো আমাদের দেশের গন্ধরাজ ফুলের মতো।

সবুজ খুব বায়না ধরে বসে ওর মায়ের কাছে যে, ওর জন্যে একটা ঐ গাছের চারা যোগাড় করে ওর মা আনতে পারে কিনা? মা কথা দেয় যে, অবশ্যই চেষ্টা করবে।

সবুজের ইচ্ছে পূরণের জন্যে ওর মায়ের মিটিং -এর শেষ দিনের বিকেলে যখন ওর মায়ের সব সহকর্মীরা বেড়াতে বের হচ্ছিল তখন একটি সেই আমের মতো দেখতে ফল গাছ থেকে ঝরে পড়ল সবুজের মায়ের সামনে। ওর মা ফলটি তুলে নিয়ে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা টিশু পেপার বের করে তা দিয়ে মুছে যত্ন করে গাড়িতে নিজের ব্যাগের পাশে রেখে দেয়। বাড়িতে নিয়ে এটা সবুজকে দেবে এটা ভেবে ওর মা বেশ খুশি হয়। সবুজের মা ওর জন্য কিছু চকোলেট আর তিন রকমের বাদাম নিয়ে এসেছে। ও সেসব পেয়ে যত খুশি হয় তার চেয়ে বেশি খুশি হয় ঐ ফলটা পেয়ে। ও লাগাবে বলে অপেক্ষা করছে যে ছুটির দিন হলে দাদুর সঙ্গে লাগাবে। হঠাৎ সবুজের মনে হলো এটা আসলে কেমন ধরনের গাছ সেটা জেনে তারপর লাগালে ভালো হবে। ও মাকে জিজ্ঞাসা করে যে এ গাছটার নাম শুনে এসেছে কিনা? মা জানায় যে শুনে আসেনি। তবে কোনো একজন শ্রীলঙ্কান বন্ধুর কাছে থেকে জেনে নেবে এবং ওকে জানাবে। সবুজ ওর মাকে বারে বারে অনুরোধ করে এটা তাড়াতাড়ি জেনে তারপর ওকে বলার জন্য। সবুজের মা ওর সদ্য পরিচিত একজন শ্রীলঙ্কান বান্ধবী সিরয়নীকে ঐ গাছের ফটো পাঠিয়ে জানতে চায় যে এটার নাম কি? এটার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাতে পারবে কিনা? সিরয়নী যে তথ্য জানালো তা জেনে সবুজ রীতিমত আঁতকে উঠে-এর নাম তামিল ভাষায় 'কাঁধালমেংগাই'। এটি বিষ জাতীয় গাছ। সঙ্গে সঙ্গে সবুজের মায়ের মনে পড়ে গেল ও একটি প্রতিবেদনে পড়েছিল কোনো একজন বাংলাদেশী কয়েক দশক আগে একবার বিদেশ ভ্রমনের সময়ে বাংলাদেশে নিয়ে এসেছিল মেহগনি গাছ। প্রথম দিকে সবাই মনে করত যে এটি বেশ উপকারী ধরনের গাছ কারণ এটা দ্রুত বেড়ে ওঠে বলে মাত্র কয়েক বছরেই একটি সংসারের জন্য বেশি টাকা দামের একটা গাছ হয়ে ওঠে এটা। তবে ধীরে ধীরে জানা গেল যে কেবল আর্থিকভাবে লাভবান হলেই তাকে উপকারী বলা যায় না। মেহগনি গাছের যেসব ক্ষতিকারক দিক রয়েছে তা অনেক বেশি ভয়ংকর। মেহগনি গাছের কারণে মাটির রস কমে যায়

ফলে মাটি দিনে দিনে উর্বরতা হারায়, এই গাছে পাখি বসে না, ফলে পাখিদের জন্যে বসার মতো গাছের সংখ্যা দিনে দিনে আমাদের দেশে কমে গিয়েছে। এ গাছের ধারে কাছে কীট-পতঙ্গ বাঁচতে পারে না। এই দিকটিকে মানুষ ভালো দিক বলে চিন্তা করে। কিন্তু একবারও ভেবে দেখে না যে, কীটপতঙ্গ না বাঁচার মানে হলো এখানে অন্যান্য প্রাণীর জন্যেও তা কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে? আমরা জানি যে, এই গাছের পাতা পানি মারাত্মকভাবে দূষিত করে ফলে দেশীয় জাতের মাছ ও বাড়ির হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রকম রোগের সৃষ্টি করে। সবুজের মা ভেবে ফেলেন যে এগুলো সবুজকে জানাবে। কারণ একটা গাছ অন্য দেশের আবহাওয়া ও পরিবেশের জন্যে উপকারী হতে পারে, তবে আমাদের দেশের জন্য উপকারী যদি না হয় সেটা নিশ্চিত না হয়ে লাগানো ঠিক হবে না। মা যখন সবুজকে বুঝিয়ে বলে তখন সবুজও ওর মায়ের সঙ্গে যোগ দেয়। কীটপতঙ্গ না বাঁচার মানে হলো এখানে অন্যান্য প্রাণীর জন্যেও তা কতটা ক্ষতিকারক হতে পারে? মানুষের জন্যে আরও কি কি ক্ষতি করে তা আমরা ভেবে দেখি না। সবুজ ওর মাকে অনেক আদর করে বলে, মা তোমার ঐ শ্রীলঙ্কান বন্ধুকে আমার হয়ে থ্যাংকস দিও, উনি জানালেন বলে আমরা একটা অনেক বড়ো ক্ষতির চাষ করা থেকে বেঁচে গেলাম। 'কাধালমেংগাই' গাছের বীজ একটি বিষ জাতীয় বীজ। 'কাঁধালমেংগাই' গাছটা হয়তো শ্রীলঙ্কার ঐ সমুদ্র পাড়ে দরকারি, কারণ সাগর পাড়ের মাটিকে আটকে রাখতে আর দ্রুত বেড়ে উঠে জঙ্গলে পরিণত করতে এটা ওখানে প্রয়োজন থাকতে পারে, যেমন মেহগনি গাছের উপকারিতা হয়তো সেই দেশে অবশ্যই ছিল, যেখান থেকে এটা আনা হয়েছিল, কিন্তু আমাদের দেশে এটাকে না আনলেই অনেক ভালো হতো। আমাদের দেশের অনেক পাখি আরো বেশি সংখ্যায় আমাদের জন্যে থাকতো। মা বলল, চলো আমরা 'কাঁধালমেংগাই' গাছের বীজটা নষ্ট করে ফেলি। না হলে এটা ময়লার সঙ্গে ফেলে দিলেও তো সেখান থেকে গজিয়ে গাছ হয়ে উঠতে পারে। সবুজ বারে বারে ভাবতে থাকে যদি সবাই মেহগনি গাছের সব বীজ আর চারা একদিন নষ্ট করে ফেলতো তাহলেও তো পাখিরা বেঁচে যেত।

রেখো না খাঁচাতে

মোহ্‌সেন আরা

পাখিরে ভরে কেন
রাখো খাঁচাতে,
পারবে কি তুমি তারে
তার মতো বাঁচাতে?
খাওয়া-উড়া দু-ই চাই
শুধু খেলে হয় না
আকাশে উড়ার পাখি
গোল খাঁচা সয় না।
মনের আনন্দ পাখির
যায় বুঝি ফুরায়ে
খাঁচা থেকে বের করে
দাও তারে উড়ায়ে।

বদলে যাবে গ্রাম

মাসুমা রুমা

ওরে খোকা গ্রামটা নাকি
হয়ে যাবে শহর
সেই শহরে থাকবে নাকি
নানান কিছুর বহর।

মাগো তুমি ভয় পেয়ো না
বলছি এবার শোনো
ভয় ছেড়ে আজ তোমার বুকে
আশার আলো বোনো।

উন্নয়নে শহর হবে আমাদের এই গ্রাম
দেখবে তখন জানবে সবাই তোমার খোকার নাম।
গ্রামের সাথে বদলে যাবে বাংলাদেশের চাষি
খুব অচিরেই ফুটবে দেখো তাদের মুখে হাসি।

চঞ্চু, নিমি আর লাভবার্ডের কথা

তাসনুভা নূহু (হিয়া)

হ্যালো, সবাইকে শুভেচ্ছা। আমি হিয়া। আমার একটি বিড়াল, একটি পাখি আর একটি খরগোশ আছে। প্রথমে আমি নিজের হাতে এনেছিলাম বিড়াল ছানাটিকে। তারপর এনেছিলাম দুইটি পাখি। ওরা লাভ বার্ড। তারপর এনেছি দুইটি খরগোশ।

একটি খরগোশকে একটি বিড়াল খেয়ে নিয়েছে। আমি অনেক কান্না করেছিলাম। তার আগে পাখি দুটো তিনটি পাখির ছানা দিয়েছিল। সেগুলো একে একে মরে গেল! আমি, আমার মা-বাবা, দাদি সবাই কান্না করেছিলাম। সবাই মিলে গিয়ে বাসার নিচে মাটিতে কবর খুঁড়ে তাদের কবর দিয়েছিলাম। এরপর একটি বড়ো পাখি মরে গেল! বাবা বললেন, এটাই নিয়ম। এতে কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই। সব প্রাণীকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। 'জন্মিলে মরিতে হয়' - এটাই সত্য।

সব মিলিয়ে এখন আমার তিনটি প্রাণী। একটি বিড়াল, একটি পাখি আর একটি খরগোশ। ওদের নিয়ে আমি অনেক খেলা করি। আমার খরগোশ কলমিশাক খেতে খুব পছন্দ করে। আমার খরগোশের নাম চঞ্চল। আমি আদর করে ওর নাম রেখেছি 'চঞ্চু'। আরেকটা যে ছিল ওর নাম ছিল 'শান্ত'। ও খুব লক্ষ্মী আর শান্ত ছিল তো, তাই!

আমার বিড়ালের নাম নিমি। নিমি খুব কিউট দেখতে। নিমি মাছ আর মাংস খেতে খুব পছন্দ করে। গরুর মাংস ওর সবচেয়ে প্রিয়। নিমিকে আমার মা-বাবা বলেন ও আমার ভাই। নিমি 'ম্যাও' ডাকলে মনে হয় যেন 'মা' বলে ডাকছে! নিমিকে আমি ইচ্ছেমতো সাজাই। ওকে জামা পরিয়ে দিই। মালা পরিয়ে দিই। আমরা কোথাও বেড়াতে গেলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যাই।

চঞ্চু নিমিকে খুব জ্বালায়! সারাক্ষণ ওর পিছু পিছু ঘুরঘুর করে! চঞ্চু পানি খায় না, নিমি চঞ্চুকে খায় না! নিমি অনেক লক্ষ্মী বিড়াল। চঞ্চুও অনেক লক্ষ্মী খরগোশ। সে নিমির সঙ্গে নিমির বাটিতে মাছ-ভাত খায়।

আমার মা ওদের নিয়মিত খাবার দেন। আমিও দিই। প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে আমি সবার আগে ওদের যত্ন নিই। আমি ওদের খুব ভালোবাসি। ওদের ছাড়া আমার ভালোই লাগে না!

দ্বিতীয় শ্রেণি, লিটল ফ্লাওয়ার একাডেমি, পীরেরবাগ, মিরপুর।

অবসরে কবুতর পালন

মোহাম্মদ অংকন

বিদ্যালয় থেকে ফেরার পর আতিকের হাতে কিছু সময় থাকে। বাবাকে একদিন বলে, 'আব্বু, তুমি আমাকে কও তো, দুপুর ও বিকেলবেলার মাঝামাঝি এই অবসর সময়টা কিবা কইরা পার করা যায়?'

'হুম বাজান, বড়ো ভালা একটা কথা বলিছ। এ সময় কাটানোর উপায় একটা আছে। আমি তোমাকে অবশ্যই কবো। তবে এহন না।'

আতিক কৌতূহলী হয়ে বলে, 'আব্বু কহন কবা নে?'

আতিকের বাবা ছেলেকে শান্ত করে জানায়, 'এইডা মনে করো তোমার জন্যি সারপ্রাইজ হবি।'

আতিকের বাবা রোজ বৃহস্পতিবার বিলদহর হাটে যায়। সেদিন ছিল আতিকের জন্মদিন। তাই তার বাবা বিলদহর হাটে গিয়ে ধান বিক্রি করে দুই জোড়া কবুতরের বাচ্চা, একটি কাঠের খোপ কিনেন। তারপর সেসব নিয়ে বাড়ি ফিরেন।

আতিক একটু অবাক হয় কবুতর ও কবুতরের খোপ দেখে। আতিকের বাবা জানায়, 'তোমার জন্মদিনের উপহার হিসেবে দেওয়া হলো। চারটা কবুতর থেকে মেলা কবুতর বানাবে। কবুতর বিক্রির টাকায় তুমি নিজের পড়ার খরচ চালাতে পারবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, কবুতরের পরিচর্যা করে তুমি তোমার অবসর সময়ডা পার করতি পারবা। এতে তোমার মনও ভালা থাকবে। পোষা কবুতরগুলো তোমাকে প্রফুল্লতায় ভরিয়ে রাখবে। বুঝতে পারিছো?'

আতিকের পড়ার ঘরের সামনে কবুতরের খোপ বসিয়ে দেওয়া হয়। আতিক জানালা দিয়ে কবুতরের খোঁজখবর রাখতে পারে। কবুতরের বাক-বাকুম ডাকে খুব ভোরে ঘুম থেকে জেগে উঠতে পারে। পড়ার ঘরের কাছে কবুতরের খোপ হওয়ায় সে খুব সহজে ওদের যত্ন নিতে পারে। খাবার ও পানি দিতে পারে।

এভাবেই আতিকের কবুতর পালনের একটি বছর পেরিয়ে যায়। কবুতরের সংখ্যা চার থেকে বেড়ে কুড়িতে গিয়ে ঠেকে। এর মধ্যে কতগুলো কবুতর বিক্রি করা হয়, তারও হিসেব থাকে না। সে কবুতর বিক্রির টাকা দিয়ে খাতা, কলম কিনতে পারে, টিফিনের টাকা জোগাড় করতে পারে। শুধু কি তাই! আতিক কবুতর বিক্রির টাকা মাটির ব্যাংকে জমাতে থাকে। একবার ঈদে আতিক তার জমানো টাকা দিয়ে মায়ের জন্য একটি শাড়ি এবং বাবার জন্য একটি পাঞ্জাবি কিনে আনে। তার বাবা-মা ছেলের এমন কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যায়। বাবা বলে, 'তুমি এত টাকা কই পাইলা? নিশ্চয়ই বড়ো ভাইয়েরা দিছে?'

আতিক বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'না আব্বু, কেউ দেয় নাই তো। তোমার দেওয়া উপহার কবুতর পালন কইরা আমি এগুলা কিন্না আনছি।'

মাও আতিককে বুকে জড়িয়ে নেয়।

আতিকের কবুতর পালনের সাফল্যের কথা তার বিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়ে। তার দেখাদেখি অনেকেই কবুতর পালন করতে শুরু করে দেয়। কেউ আর বিদ্যালয় থেকে ফিরে অলস সময় কাটায় না, বরং অবসরে পোষা পাখি কবুতরের যত্ন নেয়।

গল্প

বিলাইকে বলে ঘোলা

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

অয়নের বয়স এক বছর চার মাস। অয়নকে দেখাশোনা করার জন্য গ্রাম থেকে একটি মেয়ে এসেছে। তার নাম নাজমা। মেয়েটি খুব মিষ্টি। সুন্দর করে হাসে।

নাজমা গতকাল এসেছে। গতকাল সে কাঁদেনি। আজকে কান্না শুরু করে দিলো। ভয়ংকর কান্না। সে বলে দিয়েছে তাকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে। এখানে আর এক দিনও থাকবে না। যদি তাকে জোর করে রাখে তবে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে। নাজমার কথা শুনে অয়নের মায়ের গা কাঁপতে শুরু করেছে। অয়নের বাবা কথাটাকে পাত্তাই দিলেন না। কী ভয়ংকর কথা অথচ অয়নের বাবা হাসছেন। অয়নের মা বললেন, তুমি এভাবে দাঁত বের করে হাসবে না। তোমার হাসি দেখে আমার মেজাজ চড়ে চারশ বিশ ডিগ্রিতে ঠেকেছে। তুমি মেপে দেখতে পারো।

অয়নের বাবাও কম না। রাগে বলল, আমার সঙ্গে মেজাজ দেখিয়ে লাভ নেই। একটা ছোট্ট বাচ্চা মেয়েকে তুমি রাখতে পারছ না। এটা তোমার ব্যর্থতা।

অয়নের মা আরো রেগে গেলেন। তিনি খুব জোরে জোরে বললেন, আমার ব্যর্থতা? আমি কি ওই মেয়েকে কোলে নিয়ে নাচব। তুমি শিগগিরই তাকে বাড়িতে পাঠাও।

অয়নের মায়ের কথা শুনে নাজমা কেঁপে উঠল। সে ভয়ে রান্নাঘরে চলে গেল। রান্নাঘরের এক কোণে সে ঝিম ধরে বসে রইল।

অয়নের বাবা বলল, কোনো কাজের মেয়েই কেন তোমার ঘরে থাকে না? তার জবাব দাও আগে।

আমি জবাব দেব? আমি? আমি কী অন্যায়টা করেছি আগে বলো?

আমি তার কী জানি? তুমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞেস করো। তাহলেই উত্তর পেয়ে যাবে। না কেন কাজের

মেয়েরা থাকতে চায় না। দু-দিন থাকার পরই চলে যায় কেন?

আমি তো উত্তর আগেই পেয়ে গেছি। তোমার জন্যই এই বাসায় কোনো কাজের মেয়ে থাকে না। তাদেরকে কিছু বললেই তুমি তাদের পক্ষ নেবে। কাজের মেয়েরা তখন লাই পেয়ে যায়। মাথায় ওঠে।

তুমি অন্যায়ভাবে কথা বললে ওদের পক্ষ নেব না? আমি তোমার পক্ষ নেব?

তোমার পক্ষ নেওয়াতেই ওরা এমন করে। আমাকে মনে করে শত্রু। তোমাকে মনে করে বন্ধু। আমার শেষ কথা। তুমি নাজমাকে বাড়িতে রেখে আসো। এই মেয়ে কোনো অঘটন ঘটালে আমি এর দায়িত্ব নিতে পারব না।

না পারলে নাই। আগামী এক মাসের মধ্যে আমার কোনো ছুটি নেই। আমি যেতে পারব না।

অয়নের বাবার কথা শুনে নাজমা রান্নাঘর থেকে কেঁদে উঠল। ভীষণ কান্না।

অয়নের মা বললেন, শোনো। এখন শোনো। গরুর মতো কাঁদছে। ওকে এ বাসায় রাখা যাবে না।

অয়নের বাবা বললেন, গরু আবার কাঁদে নাকি। তুমি ঠিকমতো উপমা দেবে। উলটাপালটা উপমা দিলে আমার গায়ে আগুন ধরে যায়।

এখন কি তোমার গায়ে আগুন ধরে গেছে?

হ্যাঁ, গেছে।

তাহলে একটু সরে এসো। না হয় বইপত্রে আগুন লেগে যেতে পারে।

অয়নের বাবা বইয়ের টেবিলের পাশ থেকে একটু সরে এল। আগুনের কথা শুনে নাজমা দৌড়ে এল ড্রয়িং রুমে। ড্রয়িং রুমেই ঝগড়াটা হচ্ছিল। নাজমা দেখে কোনো আগুন নেই। নাজমা আবার রান্নাঘরে গিয়ে কাঁদতে লাগল।

অয়ন ঘুমিয়ে ছিল। সজাগ হয়ে গেছে। সেও কেঁদে উঠল।

অয়নের বাবা ছেলের কান্না শুনে বলল, এই তোমার সোনার পুত্র ছাগলের মতো কাঁদছে।

কান্নার সময় হলেই আমার সোনার পুত্র। আর হাসির সময় হলেই তোমার সোনার পুত্র। আমার ছেলেকে তুমি ছাগলের সঙ্গে তুলনা করলে? আমার মাথায় কিন্তু রক্ত উঠে যাচ্ছে।

অয়ন তো নাজমার চেয়ে কম ভলিউমে কাঁদছে। ছাগলের মতোই শোনা যাচ্ছে। অয়নকে কোলে নেওয়ার জন্য তার মা এলেন না। বাবাও না। এল নাজমা। নাজমাও কাঁদছে। অয়নও কাঁদছে। কান্নার মেলা বসে গেছে বাসায়। দুজনের মুখের ঢং দেখতে বেশ লাগে। অয়নের বাবা দুজনের কান্নার ছবি তুললেন। মনে মনে বললেন, বেশ সুন্দর। খুব সুন্দর। ভবিষ্যতে কান্নার মেলা বসানোর চিন্তা করা যেতে পারে।

অয়নের মা আর কথা বাড়াননি। ঝগড়া এখানেই থেমে গেল।

নাজমা অয়নকে কোলে নিয়ে উত্তর পাশের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অয়নের কান্না থেমে গেছে। সে রাস্তার মানুষ দেখছে। রিকশা দেখছে। পাখি দেখছে। নাজমার কান্নাও থেমে গেছে। সেও রাস্তায় করুণ চোখে তাকিয়ে আছে। মনে মনে বলছে, এই পথ ধরে একদিন সে গ্রামের বাড়ি চলে যাবে। তার মায়ের কাছে চলে যাবে। সেখানে না খেয়ে থাকলেও শান্তি। এই শান্তি এখানে নেই। এখানে অনেক খাবার আছে কিন্তু শান্তি নেই। যেতে না দিলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মরে যাবে। কী সাংঘাতিক কথা!

নাজমার মেজাজ খারাপ। সে অয়নকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময় সে অয়নের পায়ে চিমটি দিলো। অয়ন কাঁদল না। সে নাজমার মাথায় একটা থাপ্পড় দিয়ে বসল। তারপর হাসল হি হি হি...।

নাজমা তো খুব অবাক। এই ত্যাঁদড় পোলা! আমারে মারলে কেন?

অয়ন বলে, অ্যাঁ, অ্যাঁ অ্যাঁ।

নাজমা আরেকটা চিমটি দিয়ে অয়নের দিকে তাকাল।

অয়ন আরেকটা থাপ্পড় দিয়ে নাজমার দিকে তাকিয়ে হাসল। হি হি হি...। নিচের দুটি দাঁত উঠেছে। দুই

দাঁতের হাসি খুব সুন্দর। নাজমা অয়নের হাসিটি দেখে খুব আনন্দিত হয়।

নাজমা মনে মনে বলে, বড়ো ত্যাঁদড় তো। এমন বজ্জাত পোলা তো জীবনে দেখি নাই।

অয়ন নাজমার মাথায় আরেকটা থাপ্পড় দিলো। নাজমা চোখ বড়ো করে তাকাতেই সে গায়ের জোরে হাসল।

নাজমা আর অয়ন রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ অয়ন একটা বিড়াল দেখে চিৎকার করে বলল, ঘোলা ঘোলা।

অয়নের কথায় নাজমা খুব মজা পেল। সে হাসল। কী বলছ? ঘোলা? সে অয়নকে নিয়ে দৌড়ে গেল অয়নের মায়ের কাছে। বলল, খালাম্মা, অয়ন বিলাইকে বলে ঘোলা, ঘোলা। ঘোলা কী খালাম্মা? নাজমা খুব হাসল। অয়নের মাও খুব হাসলেন। মা বললেন, তুমি বিড়ালকে ঘোলা বলো?

অয়ন কী বুঝল না বুঝল তা বোঝা যায়নি। সে সামনের দুটি দাঁত বের করে হাসল। হি হি হি...। হাসলে অয়নকে খুব সুন্দর দেখায়। হেসেই হাত উঁচু করে বারান্দার দিকে যাওয়ার জন্য ইশারা দিলো।

নাজমা আবার অয়নকে নিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অয়নকে কোলে নিতে নিতে তার কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। সে অয়নকে নামিয়ে বারান্দার গ্রিল ধরে দাঁড়াল। একটু পরেই অয়ন চিৎকার করে বলল, হাতি হাতি। নাজমা অবাক হয়ে হাতি খোঁজে। কোথায় পাবে হাতি? একটা কুকুরকে দেখে বলে হাতি। নাজমা আবার অয়নকে নিয়ে তার মায়ের কাছে গেল। বলল, খালাম্মা, অয়ন কুকুরকে বলে হাতি। হি হি হি...। কিছু বলতে পারে না। অয়নের মা হাসেন। তিনি অয়নকে আদর করে বলেন, তুমি কুকুরকে হাতি বলো? অয়ন বলল, হুম্। খিলখিল করে হেসে উঠল। হি হি হি...।

পুরো ব্যাপারটায় নাজমা খুব মজা পেল। অয়নের সঙ্গে সারাদিন খেলল। বাড়ি যাওয়ার জন্য রাতে কাঁদেনি। পরদিনও কাঁদেনি। এর পরের দিনও না।

নাজমা অয়নকে নিয়ে খেলে। আর চিমটি কাটে না।

অয়নের মা-বাবা অফিসে চলে গেছেন। অফিসে যাওয়ার পরে অয়নের বড়ো খালা আসেন। দুটি শিশুকে তো বাসায় একা একা রেখে যাওয়া যায় না।

অয়নকে নিয়ে নাজমা বারান্দায় খেলতে বসে। দুজন মিলে খেলে। অয়নের অনেক খেলনা। নাজমা অন্যদিকে ফিরে তাকাতেই অয়ন একটা করে খেলনা নিচে ফেলে আর খিলখিল করে হাসে। নিচ থেকে কয়েকটা শিশু সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে যায়। নাজমা বলল, এসব ফেলছ কেন?

অয়ন হাসে।

নাজমা অয়নের গালে আলতো একটা চড় দেয়।

অয়নও নাজমার গালে চড় দেয়।

নাজমা বলল, আরে বজ্জাত পোলা। এক্কেবারে শক্ত চড় দিব।

অয়ন বলল, অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ।

নাজমা বলল, আবার আমাকে বকে? কত্তো বড়ো সাহস। সে আবার চড় দেয়।

অয়নও চড় দেয়। আর খিলখিল করে হাসে।

সন্ধ্যায় অয়নের মা অফিস থেকে আসার পর নাজমা বিচার দেয়। অয়ন সব খেলনা নিচে ফেলে দিয়েছে।

অয়নের মা কী আর বলবেন? তিনি অয়নকে আদর করে দিলেন। বললেন, সব খেলনা ফেলে দিয়েছ?

অয়ন এই সময় নাজমার গালে একটা শক্ত চড় দেয়। নাজমা বলে, দেখছেন খালাম্মা, কেমন শক্ত চড় দিলো। আমাকে সারাদিন মারছে। আমি অখন বিচার দিছি দেইক্যা আমারে মারছে।

অয়ন আরেকটা চড় দিলো। আর খিলখিল করে হাসল।

অয়নের মা বললেন, মারে না বাবা। তুমি কত লক্ষ্মী না? মারামারি করতে হয় না।

অয়নের মা দেখলেন অনেক খেলনা ফেলে দিয়েছে। অনেক দামি গাড়িটাও ফেলে দিয়েছে। বাসায় মাত্র কয়েকটা খেলনা রয়েছে।

বাসার জিনিসপত্র ফেলে দিয়ে অয়ন খুব আনন্দ পায়। কয়েক দিন আগে মায়ের মোবাইল ফোনটা তিনতলা থেকে নিচে ফেলে দিলো। আর রাস্তায় পড়ে খান খান

হয়ে গেল। এখন খেলনা আর তার কাছে কী? খেলনা তো খেলনাই।

কয়েক মাসের মধ্যে নাজমার ভালো বন্ধু হয়ে গেছে অয়ন। এখন আর ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে তার ইচ্ছে করে না। গত মাসে তার বাবা বাড়িতে নিতে এসেছিলেন। কিন্তু নাজমা যায়নি। সে বলে কিনা, অয়নকে কে দেখবে? বড়ো অবাক কাণ্ড!

নাজমার উচ্চারণ ঠিক হয় না। একদিন অয়নের মা নাজমাকে ধমক দিলেন। তুই উচ্চারণ ঠিক করবি। না-হয় অয়ন ভুল উচ্চারণ শিখবে।

নাজমা মুখের ওপর বলে দিলো। তাইলে আমারে ইশকুলে ভর্তি কইর‍্যা দেন। আফনের পোলারে আমি কেমনে ভাষা শিকামু? আমারে কি ভাষা শিকানুর লইগ্যা আনছেন?

অয়নের মা তো শুনে অবাক। তিনি অয়নের বাবার কাছে নাজমার কথা বললেন। অয়নের বাবা তো মনে হয় এক পায়ে দাঁড়া। বললেন, তা তো ঠিকই বলেছে। সে কি তোমার ছেলেকে ভাষা শেখাতে এসেছে? সে এসেছে অয়নের দেখভাল করতে।

আজ আর অয়নের মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া হয়নি। তিনি নাজমাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন। বইপত্র, খাতা, পেনসিল সব কিনে দিলেন। বললেন, ভালো করে পড়তে হবে কিন্তু।

নাজমা মাথা নেড়ে বলল, আইচ্ছা।

নাজমা প্রতিদিন স্কুলে যায়। লেখাপড়ায় সে খুব ভালো করছে। অয়নও তার সঙ্গে বসে বর্ণের ওপর আঙুল রেখে অ... অ... অ... অ... করে বই পড়ে। তার ভাব দেখে মনে হয়, সব বই বুঝেশুনে পড়ছে। অয়নের মা ছেলের কাণ্ড দেখে হাসেন। অয়নের বাবাও হাসেন।

নাজমা স্কুলে এত ভালো করবে তা অয়নের মা-বাবা ভাবতে পারেননি। পরীক্ষার রেজাল্ট শীট দেখে আনন্দে তাদের চোখ পানিতে ভরে গেল। একটা কাজের মেয়ে পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে তা কি ভাবা যায়?

অয়নের মা-বাবার আনন্দ বেড়ে গেছে। তাকে মাস্টার রেখে দেওয়ার চিন্তাভাবনা হচ্ছে। নাজমাও খুব খুশি।

বই আমার প্রাণ

নিহাল খান

ছোট্টবেলা হতেই আমার
বইয়ের প্রতি টান,
বই যে আমার ভালোবাসা
বই আমার প্রাণ।

একদিন না পড়লে বই
মনটা কেমন করে,
আবার যখন বই কাছে পাই
খুশিতে মন ভরে।

ফুল ও পাখি

আঞ্জুমন আরা

ফুল ফোটে বনে বনে,
প্রজাপতি তার সনে।
খোকা খুকু এক সাথে,
খেলা করে দিনে রাতে।

পায়রা মুরগি চড়ুই পাখি,
বন্ধু করে কাছে রাখি,
খুকু খেলে ইচিং বিচিং
ছাগল ছানা তিড়িং বিড়িং

ঘাসে ঘাসে ফড়িং নাচে,
খোকা ছোটে পিছে পিছে।
রাখাল ছেলের বাঁশির সুরে,
মন ছুটে যায় বহু দূরে।

বিদ্যালয়ে পড়তে যাই
জ্ঞানী মানুষ হওয়া চাই,
সকাল বিকাল বই পড়ি
হেসে খেলে জীবন গড়ি।

গল্প

পাখি মানুষ

কাজী কেয়া

এই প্রথম তার ঘুম ভাঙতে দেরি হলো। মায়ের কণ্ঠে বিস্ময়, কী ব্যাপার হিজল! তুমি এখনো ঘুমিয়ে। সাতটা বেজে গেছে...। রোদ ঝিলকে পড়েছে তোমার বিছানায়। তোমার বাবা নাশতা নিয়ে বসে আছেন তোমার অপেক্ষায়। মায়ের কণ্ঠ হয়ত শুনতে পেয়েছে সে। তারপর একটু চোখ মেলে, আবার পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। মা এবার একটু রাগ করলেন মনে হলো। কী ব্যাপার উঠছ না যে!

গা ছেড়ে বিছানায় উঠে বসল হিজল। মায়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল সে!

'কী, ইশকুলে যাবে না বুঝি!

'যাব। কিন্তু এত বেলা হয়ে গেল যে! দোয়েলটা শিস দিল না কেন আজ!'

'হয়ত সে শিস দিয়েছিল, ঘুমের ঘোরে তুমি তা টের পাওনি।'

কিন্তু আম্মু ওর শিস আমি শুনব না এমন তো হয়নি কোনো দিন। সে শিস দিয়ে আমার ঘুম ভাঙায়, আমি চোখ মেলি, দেখি সে তখনো শিস দিচ্ছে, নিমগাছের ডালে বসে যখন সে শিস দেয়, তখন পাতা নাচে। ভোরের হাওয়া ফুরফুর করে বইতে থাকে। আমার মন ভালো হয়ে যায়।

হাত-মুখ ধুয়ে বই নিয়ে বসি। আর অনেক পরে তুমি ওঠো। নাশতা বানাও। টেবিল সাজাও। আমিও পড়া শেষে ইশকুলে যেতে রেডি হয়ে যাই। বাবার সঙ্গে নাশতা খাই। মাগো, আজ ঠিকই দোয়েলটা শিস শোনায়নি। নইলে...।

'হতে পারে। ওরা তো পাখি। হয়ত অন্য কোথাও গেছে আজ। না হলে অসুখও হতে পারে।'

'অসুখ? পাখিদেরও অসুখ হয় আম্মু?'

'প্রাণী মাত্রই অসুখ হয়। ওদেরও তো জীবন আছে।'

'ওদের ডাক্তার আছে কি?'

'ওরা নিজেরাই ডাক্তার। ওরা জানে কোন গাছের পাতা, শেকড়বাকড় খেলে রোগ সারে।'

‘সে ভালো হয়ে যাক আম্মু। তার কণ্ঠ খুব মধুর। কত দিন সে আমার ঘুম ভাঙিয়েছে ! ওর ঋণ কখনো শোধ হবে না।’

‘আর ভেবো না। উঠে পড়ো। নাশতা সারো। ইশকুলে যাও। কাল ভোরে ঠিকই সে তোমাকে শিস শোনাবে।’

দোয়েলটা হিজলের ভাবনায় জড়িয়ে থাকে। ক্লাসে বসে সে বেঞ্চের কোণায়, জানালার পাশে। তাদের দোতলার ক্লাস রুমের গা ঘেঁষে একটা কৃষ্ণচূড়ার গাছ। গাছটা এখন ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। ঝিরিঝিরি হাওয়ায় পাতা দুলছে। ফুলের পাপড়ি ঝরছে ঝরঝর করে। অনেক পাখি এসে জুটেছে। সবগুলো শালিক। ডাকছে কিচিরমিচির করে। হিজলের চোখ খুঁজছে ঘুম ভাঙানোর বন্ধু দোয়েলটাকে। না, পায় না।

স্যার অঙ্ক দিয়েছেন। সবাই মন দিয়ে অঙ্ক কষছে। কিন্তু হিজলের মন, চোখ কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায়।

‘কী হচ্ছে! তুমি কী করছ?’

স্যারের ডাকে চোখ ফেরায় হিজল, জী স্যার!

‘অঙ্ক হয়েছে।’

‘করছি স্যার।’

না, সবাই পারলেও হিজল আজ অঙ্ক করতে পারেনি। স্যার ওর খাতায় লিখে দিলেন, ‘সে ক্লাসের ফার্স্ট বয়। অথচ আজই সে প্রথম ক্লাসে অঙ্ক পারল না। বড্ড অমনোযোগী ছিল। সারাক্ষণ কৃষ্ণচূড়া গাছের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিষয়টি আমাকে ভাবিয়েছে।’

স্কুল থেকে এসে ব্যাগটা পিঠ থেকে খুলে সোফায় ধপ করে রাখল হিজল।

মা বললেন, ‘কী ব্যাপার , তুমি কি আজ খুব ক্লান্ত?’

হিজল কথা বলে না।

‘ড্রেস বদলাও। গোসল করে নাও। খেয়েদেয়ে একটু রেস্ট নাও।’

মায়ের কথায় তাই করল হিজল। তবে আজ সে বড্ড চুপচাপ।

শোয়া থেকে হঠাৎ উঠে পড়ল। ছবি আঁকার খাতা নিয়ে বসল।

পেনসিল দিয়ে প্রথম আট লাইন আঁকল। এর পর আঁকতে বসল। পাখি আঁকল। সাদাকালো মিশেল। চোখ আঁকল, ঠোঁট আঁকল। হয়ে গেল দোয়েল। এঁকে বুকের উপর রেখে শুয়ে পড়ল। অল্পক্ষণের মধ্যেই চোখ জুড়ে রাজ্যের ঘুম। ঘুমের মধ্যে কতকিছু দেখতে পায় সে...

একটা সুন্দর ফুল বাগান। সূর্যমুখী ফুল ফুটে আছে । কত গোলাপ, ডালিয়া, গাঁদা... আরো কত ফুল। নানারঙের প্রজাপতি দুলছে ডানা মেলে। হঠাৎ একটা পাখি দেখল, বসে আছে বড়ো সূর্যমুখী পাতার ওপর। এই পাখিটা সে শিশুপার্কে একবার দেখেছিল। অপরূপ দেখতে। আম্মু চিনিয়ে দিয়েছিল। এটার নাম নীলকণ্ঠ।

‘নীলকণ্ঠ পাখির নাম?’

হিজলের প্রশ্ন। আব্বু বলেছিলেন, এর গলায় মানে কণ্ঠে একটা নীল দাগ আছে। এজন্য হয়ত তার নাম নীলকণ্ঠ।

‘তা এই পাখি গান গাইতে পারে?’

‘ভারি চমৎকার গাইতে পারে। এটা মিষ্টি গানের পাখি।’

ইচ্ছে ছিল ওর গান শোনার, কিন্তু একটি দুষ্টু ছেলে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিলে ওটা এক মুহূর্তে কোথায় উড়ে চলে যায়।

স্বপ্নে আজ সে সেই পাখিটাকে দেখে খুব খুশি হলো।

আরো কয়েকটা পাখি। লেজ ঝোলা ফিঙে, ধূসর রঙের কী একটা পাখি। কালো রঙের শ্যামা, টোপর পড়া কাঠঠোকরাও কোথা থেকে হাজির হলো। বাগানটা পাখিদের উপস্থিতিতে আরো সুন্দর হয়ে উঠল।

‘কিন্তু আমার সেই দোয়েলটাকে দেখছি না কেন!’ হিজল ভাবতে থাকে, আর এদিক-ওদিক তাকায়। হঠাৎ ট্রিট ট্রিট... শিস শুনল হিজল। শিসটা এবার একটানা বেজে চলল।

‘কিন্তু তুমি কোথায়? আহ্ একটা নাম দিতাম যদি তার, দোয়েল বললে তো সব দোয়েলকে বোঝায়। ওকে না হয় এবার থেকে সুইটি বলে ডাকব।’ একথা ভেবে যেই ডাকতে যাবে অমনি শিসটা থেমে গেল।

‘থামলে কেন সুইটি? গাও না। তোমার মধু শিস না শুনলে যে আমার ঘুম ভাঙবে না!’

ব্যাস । অমনি আবারো একটা ট্রিট ট্রিট টুই...টুই শিস বাজাতে থাকে সুইটি।

হিজল ঘুম ভেঙে লাফ দিয়ে ওঠে। তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে।

‘হিজল...’ ডাকলেন আম্মু। ‘বিকাল তো হয়ে গেল! বোধ হয় তুমি স্বপ্ন দেখেছিলে। এখন তো সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই। ওঠো, খুব ঘুমালে কিন্তু।’ মা পাশের ঘর থেকে এসে মৃদু হেসে বললেন।

‘সত্যিই স্বপ্ন দেখেছিলাম তাহলে। মনে মনে ভেবে হিজল বলল, ‘আম্মু ওর নাম রাখলাম সুইটি।’

‘কার নাম?’

‘দোয়েলটার।’

‘খুব ভালো নাম।’

‘ওই নামে ওকে ডাকতেই সাড়া দিল। শিস দিতে শুরু করল।’

‘দেখলে তাকে?’

‘না দেখা গেল না।’

‘কাল সকালে হয়ত তোমার ঘুম ভাঙাতে আসবে।’

হাসল হিজল। ওর হাসিমুখ দেখে মা খুশি হলেন। বললেন, ‘পাখিরা খুব ভালো। ওরা প্রকৃতিকে সুন্দর রাখে।’

‘আর মানুষকে গান শুনায়। ঘুম ভাঙায়।’ হিজলের কথায় মা বললেন, ‘আর ঘুমপাড়ায়ও পাখিরা। কবিতায় পড়েছি,‘পাখির গানে ঘুমাই, আবার পাখির গানে জাগি।’

‘কার কবিতা আম্মু?’

‘মনে পড়ছে না, তবে কোথায় যেন কবে পড়েছি।’

না। পরদিনও ঘুম ভাঙতে দেরি হলো হিজলের। এদিনও মা ডেকে ওঠালেন।

হিজল মন খারাপ করে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে দাঁড়াল গিয়ে ব্যালকনিতে। ঝিরিঝিরি বাতাসে নিমপাতা থিরথির করে কাঁপছে।

‘তাহলে সুইটি কি আর আসবে না? সত্যিই কি অসুখ?’ ভাবছে ব্যালকনির দেয়াল ধরে। হঠাৎ করে হাতের স্পর্শে ঘাড় ঘোরালো। দেখে আব্বু। চোখ ছলছল হিজলের।

‘কী? তোমার পাখি আজও শিস শোনায়নি বুঝি?’

হিজল যেন কেঁদে ফেলবে। আব্বু ওকে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, ‘পাখির জীবন খুব ছোট্ট। হয়ত তাই হয়েছে। যদি আর সে না আসে, শিস না শোনায়, দুঃখ করো না।’

হিজল আব্বুর মুখের দিকে প্রশ্ন জাগা চোখে তাকায়। আব্বু হাসেন। বলেন, ‘এটাই সত্যি। ওরা গান শুনিয়ে সুখ পায়। শিস বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুম ভাঙায়। যেমন তোমার ঘুম ভাঙাত দোয়েলটা। ওর শিস শুনে তুমি ঘুম থেকে জেগে পড়তে বসতে। আহা... মানুষ যদি পাখির মতো হতো!’

‘তা হলে কী হতো আব্বু।’

‘পৃথিবীটা আরো সুন্দর হতো। সবাই সবার হতো। পাখিরা যেমন মানুষকে গান শুনিয়ে শিস শুনিয়ে আনন্দ পায়, তেমনি আমরা যদি সবার সুখের জন্য সবাই কাজ করতাম... হিংসা-লোভ, হিংস্রতা, দ্বন্দ্ব– এসব বিসর্জন দিয়ে যদি সবার সুখে নিজের সুখ খুঁজে নিতাম... তাহলে পৃথিবী কত সুন্দর হতো। একটু ভেবে দেখো তো।’

‘আব্বু , আমরা কি তাহলে পাখি হতে পারি না?

‘কেন পারি না। ইচ্ছে করলে পাখি হতে পারি। তুমিও পারো। ঠিকমতো পড়াশুনা করো। তারপর বড়ো হয়ে পাখির মতো পরহিতে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারো।

দেশের জন্য কাজ করতে পারো।'

'পাখির তো ডানা আছে। উড়তে পারে।'

'মানুষের ডানা তার হাত। এই হাত কাজের জন্য। বুদ্ধির বলে মানুষ আবিষ্কার করেছে নানা যানবাহন, উড়োজাহাজ এসবে ভর করেই তো ইচ্ছে করলে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় উড়ে যেতে পারে। ডানা থাকে পাখির, মানুষের ডানার দরকার নেই।'

'আব্বু আমি পাখি হতে চাই।'

'অবশ্যই হবে! তুমি হবে পাখি মানুষ। চলো নাশতা করে নেই। আজ তো ছুটির দিন। আমরা আজ নভোথিয়েটারে যাব রাতের আকাশ দেখতে।'

রাতে আম্মু দেখেন হিজল পাশে নেই। কোথায় গেল। পা টিপেটিপে যান পাশের ঘর– হিজলের রিডিং রুমে। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে হিজল তার সবুজ মলাটের খাতায় কী সব লিখতে লিখতে টেবিলে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে গেছে। আম্মু তার খাতাটা নিয়ে পড়তে থাকেন। হিজল লিখেছে–

'আমি আমার মিষ্টি পাখি দোয়েলের মতো হতে চাই। সে শিস শুনিয়ে আমার ঘুম ভাঙাত। আমিও তেমনি অলস মানুষদের জাগিয়ে তুলব। পাখিরা যেমন মানুষকে গান শুনিয়ে আনন্দ পায়, আমিও তেমনি বড়ো হয়ে মানুষের মঙ্গল করব। আনন্দে ভরিয়ে তুলব সবার জীবন। আর দেশকে ভালোবাসি আমি। বড়ো হয়ে দেশের জন্য অনেক কাজ করব। আব্বু বলেছে, তুমি পাখি মানুষ হবে। আমি তাই পাখি মানুষ হতে চাই...'

আম্মু খাতাটা নিয়ে বুক সেলফের উপরের তাকে রেখে দিয়ে ঘুমন্ত হিজলকে বুকে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। আম্মু পরম আদরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, সোনা আমার, তোমার স্বপ্ন সফল হোক।

তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। হঠাৎ টুইট টুইট শিস ভেসে এল। আম্মু জানালা দিয়ে তাকালেন। হিজলের দোয়েলটাই বুঝি...।

বাবা তোমায় ভালোবাসি

ইমরান পরশ

আমি যখন ছোট্ট ছিলাম পা পা করে হাঁটি
মন ছিল যে পাখির মতো নয়তো পরিপাটি।
বাবার ঘাড়ে চড়ে যেতাম দূরের খোলা মাঠে
ঝুনঝুনিটা হাতে দিয়ে যেতেন বাবা হাটে।
মায়ের সে কী শাসন, শুধু বাবার জন্যে পোড়ে!
এই জন্যে কী দীর্ঘ নয় মাস রাখছি পেটে তোরে?
মা তোমাকে ভালোবাসি ঠিকই বাবার মতো
আমার হৃদয় ভাগ করে দেই তাদের ইচ্ছে যত।
বাবার সাথেই জমতো আমার নানানরকম খেলা
ঘুম ভাঙানি রোদ্র সকাল- স্নিগ্ধ বিকেলবেলা।
লাঙল-জোয়াল কাঁধে বাবা সূর্যকে দেন আড়ি
ক্লান্ত শরীর ভরদুপুরে আসেন ছুটে বাড়ি।
পানির গ্লাস হাতে মা জলদি আসেন ছুটে
কষ্ট বুঝি জোনাক হয়ে যায় তখনই টুটে।
ঘামের গন্ধ হয় না মালুম লুটাই বাবার বুকে
সব ক্লান্তি ভুলে বাবা আগলে ধরেন সুখে।
আয় বাছাধন আয়রে বুকে তোকে নিয়ে হাসি
সত্যি বাবা তোমায় আমি অনেক ভালোবাসি।

বাবা আমার বাবা

মেজবাউল হক

‘কাটে না সময় যখন আর কিছুতে/বন্ধুর টেলিফোনে মন বসে না/জানালার গ্রিলটাতে ঠেকাই মাথা/মনে হয় বাবার মতো কেউ বলে না/ আয় খুকু আয়, আয় খুকু আয়...’। এই গানটি সন্তানদের এক অসীম নস্টালজিয়ায় ডুবিয়ে দেয়। বাবা এমন একটি নাম। ছোটো-বড়ো, অখ্যাত-বিখ্যাত সকলের কাছেই বাবা অসাধারণ। যার ছায়াতলে সন্তানেরা থাকে নিরাপদ আবৃত। আর বাবার তুলনা বাবা নিজেই। যার কল্যাণে এই পৃথিবীর রূপ, রং ও আলোর দর্শন। বাবা শাশ্বত, চির আপন, চিরন্তন। বাবার স্নেহ-ভালোবাসা সকলেরই প্রথম চাওয়া আর পাওয়া। আর এই বাবাকে নিয়ে প্রতিবছর জুন মাসের তৃতীয় রবিবার পালন করা হয় ‘বিশ্ব বাবা দিবস’।

বিশ্বের ৭৪টি দেশে বাবাকে নিয়ে পালিত এই দিবসটি। পিতার প্রতি সন্তানের সম্মান, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা প্রকাশের জন্য দিনটি বিশেষভাবে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে। হাজারো কষ্ট সয়ে তিলে তিলে সন্তানকে বড়ো করেছেন যে বাবা, তাকে ঘিরেই এমন একটি দিবস সকল সন্তানেরর কাছেই একটি ব্যতিক্রমী পাওনা।

ধারণা করা হয়, ১৯০৮ সালের ৫ই জুলাই, আমেরিকার পশ্চিম ভার্জেনিয়ার ফেয়ারমন্টের এক গির্জায় এই দিনটি প্রথম পালিত হয়। আবার, সনোরা স্মার্ট ডড নামের ওয়াশিংটনের এক নারীর মাথাতেও বাবা দিবসের আইডিয়া আসে। যদিও তিনি ১৯০৯ সালে ভার্জিনিয়ার বাবা দিবসের কথা একেবারেই জানতেন না। ডড এই আইডিয়াটা পান গির্জার এক পুরোহিতের বক্তব্য থেকে, সেই পুরোহিত আবার মাকে নিয়ে অনেক ভালো ভালো কথা বলছিলেন। তার মনে হয়, তাহলে বাবাদের নিয়েও তো কিছু করা দরকার। ডড আবার তার বাবাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি সম্পূর্ণ নিজ উদ্যোগেই পরের বছর, অর্থাৎ ১৯১০ সালের ১৯শে জুন থেকে বাবা দিবস পালন করা শুরু করেন। ১৯১৩ সালে আমেরিকান সংসদে বাবা দিবসে ছুটি ঘোষণার জন্য একটি বিল উত্থাপন করা হয়। ১৯২৪ সালে সে সময়কার আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজ বিলটিতে পূর্ণ সমর্থন দেন। ১৯৬৬ সালে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন বি জনসন বাবা দিবসে ছুটি ঘোষণা করেন।

বাবা দিবসে শ্রদ্ধা আর ভালবাসা পূর্ণতা পাক, দৃঢ় হোক পরিবারের বন্ধন। নবারুণ -এর পক্ষ থেকে পৃথিবীর সকল বাবার প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।

বাবা আমার

মো. জাওয়াদ হোসেন

বাবা আমার অনেক প্রিয়
ডাকতে লাগে ভালো
তিনিই আমার চলার পথের
অন্ধকারের আলো।

বাবা আমার স্বপ্ন সারথি
আমার সকল আশা
বাবা দিবসে বাবার প্রতি
রইল অনেক ভালোবাসা

সপ্তম শ্রেণি, হায়দার আলী স্কুল, মান্ডা

শ্রাবন সরকার, তৃতীয় শ্রেণি, এস এম মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোপালঞ্জ

মায়মুনা বিনতে মাহবুব, অষ্টম শ্রেণি, সানাড়পার শেখ মোরতোজা আলী উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

ব্ল্যাকহোলের প্রথম ছবি

মিজান চৌধুরী

ব্ল্যাকহোলের বাংলা অর্থ কালো রঙের গর্ত। আরেকটু গুছিয়ে বলা হয় কৃষ্ণগহ্বর, কেউ কেউ বলেন কৃষ্ণবিবর। বুঝতেই পারছ, কৃষ্ণ মানে কালো। গহবর, বিবর গর্তেরই আরো দুটি সমার্থক শব্দ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ব্ল্যাকহোল বললেও ভয়টা যেরকম লাগে, কৃষ্ণবিহবর, কৃষ্ণবিবর বা কালো রঙের গর্তের কথা শুনলেও একই রকমের ভয় লাগে। ইয়া বড়োসড়ো কুচকুচে কালো গর্তরা নাকি বাস করে মহাশূন্যে, যা মোটেও শূন্য নয়, কত্ত কী যে আছে, তা এখনো জেনে উঠতে পারেননি বিজ্ঞানীরা।

ব্ল্যাকহোল নিয়ে কতটুকু জানতে পারা গেছে? মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ও স্বভাব কেমন, তা বোঝাতে ব্ল্যাকহোলকে বুঝতে হবে। কেননা, ব্ল্যাকহোল খুব বেশি ঘন সন্নিবিষ্ট, এর অতি ক্ষুদ্র আয়তনে ভর এতই বেশি যে, এর মহাকর্ষীয় শক্তি কোনো কিছুকেই তার ভিতর থেকে বের হতে দেয় না, এমনকি আলোর মতো তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণকেও নয়। সবকিছুকে গিলে খায় যেন এই কালো গর্ত। তার ফলে এর একটুখানি জায়গাতেই সাধারণ মহাকর্ষীয় বলের মান এত বেশি হয়ে যায় যে, এটি মহাবিশ্বের অন্য সকল বলকে অতিক্রম করে। ফলে এ থেকে কোনো কিছুই পালাতে পারে না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাকর্ষের ধারণার ভিত্তিতে কৃষ্ণগহ্বর থাকতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা আন্দাজ করতে শুরু করেন। বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বিশ শতকে এসে সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব উপস্থাপন করলেন। এই তত্ত্ব অনুসারে, কৃষ্ণগহ্বর তৈরি হয় খুবই বেশি পরিমাণ ঘনত্ব বিশিষ্ট ভর থেকে। কোনো অল্প স্থানে খুব বেশি পরিমাণ ভর একত্র হলে সেটা আর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকতে পারে না।

মহাবিশ্বকে একটি সমতল পৃষ্ঠে কল্পনা কর, তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবে। মহাবিশ্বকে চিন্তা কর একটি বিশাল কাপড়ের টুকরো হিসেবে, যার পৃষ্ঠ সমতল। এরপর তুমি যদি কাপড়ের উপর কোনো জায়গায় ভারী বস্তু রাখ, তাহলে কি দেখবে? ভারী বস্তু আছে বলেই সেই জায়গার কাপড় একটু নিচু হয়ে যাবে। এই একই বাপার ঘটে মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে। যেসব স্থানে ভর অচিন্তনীয় পরিমাণ বেশি সেইসব স্থানে গর্ত হয়ে আছে, এক স্থানে কুণ্ডলিত হয়ে অচিন্তনীয় অসামান্য ভর স্থান-কাল বক্রতার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ এই স্থানে স্থান আর সময় বেঁকে যায়। আকারটা হয়ে যায় যেন গর্তের মতো।

প্রতিটি গ্যালাক্সিতে আছে ছোটোবড়ো কম-বেশি কৃষ্ণগহ্বর। সাধারণত বেশিরভাগ গ্যালাক্সিই তার

মধ্যস্থ কৃষ্ণগহ্বরকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। এতকাল কথাগুলো বিজ্ঞানীরা বলতেন তত্ত্ব আলোচনার মতো করে। কেননা, তাঁদের হাতে ছিল না কৃষ্ণগহবর থাকার প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ। একে তো কেউ দেখেনি। এর ছবি তোলা মনে হতো অসম্ভব এক ব্যাপার। কেননা, এ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে পারে না। এর উপস্থিতির প্রমাণ হিসেবে বলা হতো, কোনো স্থানের তারা ও নক্ষত্রের গতি এবং দিক দেখে বুঝতে হবে কৃষ্ণগহবরের টান কোন্ দিক থেকে আসছে। মহাকাশবিজ্ঞানীরা ১৬ বছর ধরে আশে-পাশের তারামণ্ডলীর গতি-বিধি পর্যবেক্ষণ করে গত ২০০৮ সালে প্রমাণ পেয়েছেন অতিমাত্রার ভর বিশিষ্ট একটি কৃষ্ণগহ্বর আমাদের আকাশগঙ্গার মাঝখানে বাস করছে। এর ভর আমাদের সূর্য থেকে ৪ মিলিয়ন বা ৪০ লক্ষ গুণ বেশি।

১১ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে দুটি কৃষ্ণগহ্বরের এক হয়ে যাওয়ার ফলে মহাকর্ষীয় তরঙ্গের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। সেই থেকে শুরু হলো মহাকর্ষীয় তরঙ্গ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১টি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে পারেন বিজ্ঞানীরা। ২০১৭ সালে ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ দ্বারা মেসিয়ের ৮৭ ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত অতিভারী কৃষ্ণগহ্বরের পর্যবেক্ষণ করা গেল। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ শেষে ১০ই এপ্রিল ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো একটি ব্ল্যাকহোলের আলোকচিত্র প্রকাশিত হয়। ব্ল্যাকহোলের ছবি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে, খবরটি ছড়িয়ে পড়েছিল বেশ আগেই। সারা পৃথিবীর মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল সেই ছবি দেখতে, যা কখনো দেখা সম্ভব হবে বলে কেউ ভাবেনি। এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার পর বিজ্ঞানীদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে অনেক। আমরা আমাদের মহাবিশ্বকে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব এখন।

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন (এনএসএফ) একযোগে ছয় দেশ থেকে সংবাদ সম্মেলন করে ব্ল্যাকহোলের ছবিটি প্রকাশ করে। পৃথিবীর ৮ মহাদেশে বসানো অত্যন্ত শক্তিশালী ৮টি রেডিও টেলিস্কোপের নেটওয়ার্কের সাহায্যে ছবিটি তোলা হয়। ২০১৭ সালে ছবি তোলার কাজ শুরু হয় দুইশ'রও বেশি বিজ্ঞানীর সাহায্যে।

ছবিতে দেখা যায়, হলদে রঙের ধুলো ও গ্যাসের একটি চক্র ডোনাটের মতো প্রকাণ্ড আকারের কালো ব্ল্যাকহোলকে ঘিরে রেখেছে। ধুলা ও গ্যাসের চক্র ব্ল্যাকহোলের খাদ্য জুগিয়ে যাচ্ছে। এই ব্ল্যাকহোলটি আছে আমাদের পৃথিবী থেকে ৫০০ মিলিয়ন ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরের গ্যালাক্সি মেসিয়ার ৮৭-এর মাঝখানে। সূর্যের চেয়ে সাড়ে ছয় বিলিয়ন গুণ ভারী এই ব্ল্যাকহোলটি সবচেয়ে ভারী ব্ল্যাকহোলগুলোর মাঝে অন্যতম। মহাবিশ্বে ৪ হাজার কোটি কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে এটি।

অসম্ভব ছিল ব্ল্যাকহোলের ছবি পাওয়া। একে সম্ভব করলেন কে, জানো? এমআইটিতে কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক করছিলেন কেটি বোম্যান। ২৯ বছরের এই তরুণী একটি অ্যালগোরিদম দাঁড় করিয়েছিলেন তিন বছর আগে, যার ফলে সম্ভব হয়েছে অসম্ভব কাজটি। বোম্যান এই অ্যালগোরিদমের নাম দিয়েছেন সিএইচআইআরপি। আটটি টেলিস্কোপ থেকে সার্বক্ষণিক পেতে থাকা তথ্য এক করে এই অ্যালগোরিদম। তথ্য এক করার পর তাকে ছবিতে বদলে দেয়।

কেটি বোম্যান

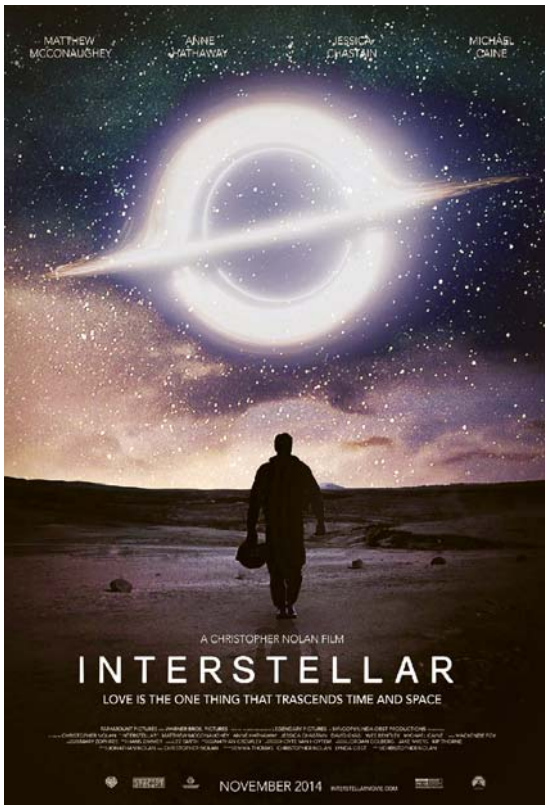

ইন্টারস্টেলার এবং ব্ল্যাকহোল

সায়েরে নাজাবী সায়েম

২০১৪ সালে মুক্তি পাওয়া জনপ্রিয় এবং অত্যন্ত ব্যবসা সফল, দুঃসাহসিক মহাকাশ অভিযান ফিল্ম ইন্টারস্টেলার আজও মুক্তির ৫ বছর পরে তার রেশ কাটেনি। তার প্রধান একটি কারণ হলো সম্প্রতি ব্ল্যাকহোল -এর ছবি প্রকাশিত হওয়ার ঘটনা।

মহাকাশচারী একটি দল মানব সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখা নিশ্চিত করার একটি প্রচেষ্টা ইতোমধ্যে একটি ওয়ার্ম হোলের মাধ্যমে ভ্রমণ করে, প্রধানত এইটা নিয়েই ইন্টারস্টেলার নির্মিত।

ফিল্ম ইন্টারস্টেলারে, কুপার (ম্যাথিউ ম্যাককোনাগেই দ্বারা অভিনীত) ব্ল্যাকহোল এর মধ্যে পড়ে যায়। কুপারের জাহাজটি শক্তির কারণে ভেঙে যায়। তিনি শেষ পর্যন্ত ব্ল্যাকহোল থেকে বের হতে পারেন এবং একটি টেসেরাক্ট- একটি চার মাত্রিক ঘনক্ষেত্রের মধ্যে গিয়ে পৌঁছান।

ফিল্মটিতে ব্ল্যাক হোলের বেশ অনেক দৃশ্য উপস্থাপন করা হয় যদিও ব্ল্যাকহোলের আসল রূপ এখনো মানুষের কাছে অচেনা। ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ প্রথমবারের মতো একটি ব্ল্যাক হোলের ছবি নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং তা খুব শিগগির পরিবেশন করা হবে। কিন্তু ৫ বছর আগে ব্ল্যাকহোল -এর এত চিত্রানুগ বা সঠিক উপস্থাপন কি করে করা হলো? ইন্টারস্টেলার শুধু মাত্র কল্পনার সাথে বৈজ্ঞানিক ধারণা এবং টেকনিক্যাল দক্ষতার সাথে নির্মিত একটি সিনেমাটিক মহাবিশ্ব এবং বিশেষ করে ব্ল্যাকহোল তৈরি করেছে।

কিপ থর্ন থিনি কিনা একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, বৈজ্ঞানিক পরামর্শদাতা এবং ইন্টারস্টেলার-এর নির্বাহী প্রযোজক, ব্ল্যাক হোলের ব্যাপারে বলেছেন যে তিনি সমীকরণগুলোতে কাজ করেছিলেন যা আলোর রে গুলোকে ট্রেসিং করতে সক্ষম হতো, যখন তারা ওয়ার্ম হোল বা ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি ভ্রমণ করেছিল। তাই আমরা যা দেখি তা আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা সমীকরণের উপর ভিত্তি করে। প্রারম্ভিক প্রক্রিয়ার মধ্যে থর্ন দুটি নির্দেশিকা তুলে ধরেছিলেন: প্রথমত, যে-কোনো প্রতিষ্ঠিত শারীরিক আইন লঙ্ঘন করবে না। দ্বিতীয়ত, সমস্ত কাল্পনিক ধারণা বিজ্ঞানের থেকে উদ্ভূত হবে এবং কোনো চিত্র লেখকের মন থেকে নয়। ছবির নির্মাতা ক্রিস্টোফার নলান কোনো সমঝোতা করেননি ছবির মানের ক্ষেত্রে। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী মিচিও কাকু তার বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার জন্য এই চলচ্চিত্রটির প্রশংসা করেছেন এবং বলেছেন, 'বহু বছর ধরে বিজ্ঞান কথাসাহিত্য চলচ্চিত্রের জন্য স্বর্ণের মান নির্ধারণ করতে পারে'। একইভাবে, সাবেক নাসা সফ্টওয়্যার প্রকৌশলী টিমোথি রেয়েস বলেন, 'থর্ন এবং নোলানের ব্ল্যাক হোল এবং ওয়ার্ম হোলের হিসাব এবং মাধ্যাকর্ষণ ব্যবহার চমৎকার।'

ব্ল্যাক একটি তারা যা তা নিজের মাধ্যাকর্ষণের কারণে ভেঙে পড়েছে এবং এত বেশি শক্তি আবহ করে যে

তাতে আলোও হার মানে। একটা বিতর্ক আছে যে ব্ল্যাক হোলে পড়ে গেলে আপনার পা দুটি আপনার মাথার তুলনায় একটি শক্তিশালী মহাকর্ষীয় টান অনুভব করে, কারণ তারা ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি। ফলস্বরূপ, আপনার শরীরের পৃথক প্রসারিত হয়। ছোটো ব্ল্যাকহোলের জন্য, এই শরীর প্রসারিত হওয়াটা এতটাই শক্তিশালী যে আপনি দিগন্তে পৌঁছানোর আগেই আপনার শরীর সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কিন্তু ইন্টারস্টেলারে কুপার ব্ল্যাক হোলের মধ্যে পড়ে গিয়ে আবার উঠে আসবেন। একদম উলটো ব্যাপার!

ইন্টারস্টেলার সঠিক ছিল। একটি ব্ল্যাকহোলের মধ্যে পতন মানে সব শেষ না, অধ্যাপক স্টিফেন হকিং নিজে দাবি করেছেন। যদিও পদার্থবিজ্ঞানীগণ মনে করেছিলেন যে একটি ব্ল্যাকহোলের বিশাল মহাকর্ষীয় শক্তি দ্বারা সমস্ত বস্তু ধ্বংস করতে হবে, তবে হকিং সুইডেনের প্রতিনিধিদের বলেছিলেন যে, এটি পালাতে পারে এবং অন্য মাত্রায়ও পপ করতে পারে। এই তত্ত্বটি তথ্য প্যারেডক্স সমাধান করেছে যা কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানীকে বিভ্রান্ত করেছে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স বলে যে, কিছুই ধ্বংস করা যাবে না কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতা বলে এটি অবশ্যই হতে হবে।

তবে হকিং-এর নতুন তত্ত্বের অধীনে বলা হচ্ছে যে, কোনো কিছু যদি ব্ল্যাকহোল চুষে নেয়, তা কার্যকরভাবে ঘটনা দিগন্ত যা কিনা ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি একটি তাত্ত্বিক সীমানা অতিক্রম। যা থেকে কোনো আলো বা অন্যান্য বিকিরণ পালাতে পারে না, সেখানে আটকে থাকে।

হকিং এছাড়াও বিশ্বাস করেন যে, ব্ল্যাকহোল ছাড়ার বিকিরণ ঘটনা দিগন্তে সংরক্ষিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং এটি ফিরিয়ে আনতে পারে। যাইহোক এটি ফিরিয়ে আনার পর একই অবস্থায় থাকার সম্ভাবনা নেই। বেশ অনেক ধারণা আছে ব্ল্যাকহোলদের নিয়ে তার মধ্যে একটি নিয়ে হকিং বলেছেন যে, ব্ল্যাকহোল তার আঁকা ছবির হিসেবে অতটাও কালো নয়। তাঁদের শাশ্বত কারাগারের মতো করে ভাবা হয় কিন্তু তা সঠিক না।

যা আমরা চোখে দেখি না, তা নিয়ে আমাদের অনেক অনুমান এবং কল্পনা বিরাজ করে। ঠিক তাই হয়েছে ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রেও। কিন্তু এই অনুমানের মধ্যে ইন্টারস্টেলার সিনেমাটির ব্ল্যাকহোলের প্রদর্শন, সত্য-এর খুব নিকট দাবি করেছেন হকিংসহ বেশ অনেক জ্ঞানীজনেরা। ব্ল্যাকহোলের ছবি উপস্থাপন হলে আরো অনেক ভুল ভেঙে যাবে এবং পদার্থবিজ্ঞানের জন্য নতুন দরজা খুলে যাবে। হকিং বেঁচে নেই কিন্তু তার ধারণাগুলো রয়ে যাবে যতদিন ব্ল্যাকহোল আছে, এই মহাবিশ্ব আছে, আমরা আছি।

এ লেভেল পরীক্ষার্থী, মাস্টারমাইন্ড স্কুল, ঢাকা।

আদনান আল আসাদ, সপ্তম শ্রেণি, চৌগাছা শাহাদৎ পাইলট মডেল বিদ্যালয়, যশোর

কল্প গল্প

বিম্ব

কৃণন মাহমুদ নিয়োগী

বৃষ্টিতে রাস্তাটা ভিজে গেছে। মানুষজন রঙিন ছাতা মাথায় হাঁটছে। গাড়ি ঘোড়া চলছে সাঁই সাঁই করে। কিছু শিশু বৃষ্টিতে ভিজছে আর হই হুল্লোড় করছে। ইশ্ কী মজাই না করছে ওরা।

রাস্তায় শিশুদের মজা করতে দেখে হিংসে হচ্ছে পিকুর। সে বারান্দায় বসে আছে একমনে আর দেখছে চারপাশ। টবের গাছগুলো বৃষ্টি পেয়ে যেন আরো বেশি তাজা হয়ে গেছে। দুটি চড়ুই পাখি ভিজে চুপসে এখন পিকুর বাসায় আশ্রয় নিয়েছে।

আজকে পিকুর স্কুল থেকে পিকনিকে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে সব মাটি হয়ে গেল। বৃষ্টি পিকুর খুব ভালো লাগলেও আজকে একটুও ভালো লাগছে না। মা-বাবা দুজনই ছোট্ট পিকুকে একা বাসায় রেখে চলে গেছেন বেড়াতে।

অবশ্য ছোট্ট পিকু আর সেই ছোট্টটি নেই। কয়েকদিন গেল পিকুর বয়স বারো বছর হয়েছে। আর পিকুও বাসায় একা থাকতে ভয় পায় না। কিন্তু আজ আকাশে মেঘ। বাসায় বিদ্যুৎও নেই। বাসার ভেতর কেমন জানি ছমছমে একটা ভাব।

হঠাৎ করে খচ খচ একটা আওয়াজ হলো ঘরের ভেতর। পিকু শব্দের উৎস খোঁজার জন্য উঠে দাঁড়ায়। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পিকুর বুক কেঁপে উঠছে। কিন্তু কৌতূহল তো দমানো যাচ্ছে না। পিকু আবার কেমন একটা আওয়াজ শুনে। এবার কার জানি হাসির শব্দ। কী ভয়ানক সেই হাসি। পিকু আস্তে আস্তে ঘরের ভেতরে ঢোকে। না, কোথাও কেউ নেই। অবশ্যই অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছে না। পিকু দৌড়ে যায় সেখানে। না, কেউ নেই, তবে শব্দ কোথা থেকে আসছে?

হঠাৎ টপ টপ শব্দ আসছে বাথরুম থেকে। আজব ব্যাপার। পিকু ভাবতে থাকে। এমন তো কখনো হয়নি। আজ সবকিছু এমন ভূতুড়ে লাগছে কেন? পিকু বাথরুমে যায়, ট্যাপ বন্ধ করা হয়নি। সেখান থেকেই পানি পড়ছে।

পিকু ট্যাপ বন্ধ করে বের হতে যাবে এমন সময় বাথ রুমের আয়নায় তার চোখ পড়তেই বুকটা ধক করে ওঠে। আয়নার ভেতর সে নিজেকে দেখতে পারছে না। মনে হলো তার পাশে কেউ দাঁড়িয়েছে। পিকু আস্তে আস্তে ঘাড় ঘোরায়। এরপর সে যা দেখে তাতে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় কয়েক গুণ।

পিকুর পাশে তারই মতো দেখতে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। তারই মতো বললে ভুল হবে। এটি তো সে-ই। তাহলে আয়না থেকে কি নিজের প্রতিবিম্ব বের হয়ে এসেছে?

পিকু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে চায়। কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো আওয়াজ বের হচ্ছে না। পিকু দৌড়ানোর চেষ্টা করে, কিন্তু তার পা যেন জায়গা থেকে নড়ছে না। পিকু আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, 'কে তুমি?'

অন্য মূর্তিটি উত্তর দেয়, 'চিনতে পারছ না? আমি পিকু। কতদিন ধরে আয়নার ভেতর বন্দি করে রাখবে আর আমায়? এবার তো মুক্তি দিতেই হবে।'

পিকু আরো ভয় পায়। সে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাও তুমি আমার কাছে? কেন এসেছ এখানে?'

পিকুর প্রতিবিম্বটি কিছু বলে না। প্রাণ খুলে হাসতে থাকে। সেই হাসি শুনলে মনে হয় জীবন বেরিয়ে যেতে চায়। পিকু ঘামতে থাকে। তার মাথা কাজ করছে না। সে দৌড় দেয়। দৌড়াতে গিয়ে হোঁচট খায়। পেছনে ফিরে দেখে তার বিম্ব ঠিক তার পিছে। সে বলছে, 'পিকু, তুমি পালাতে পারবে না। কষ্ট করে কোনো লাভ নেই।' কথাটি শেষ করেই পিকুর হাত ধরে। কী

ঠান্ডা তার হাত! যেন জমাট বাঁধা বরফ। পিকু প্রাণপণ চেষ্টা চালায় ছুটে যাওয়ার জন্য কিন্তু কিছুতেই ছুটতে পারে না।

তার বিম্বটি পিকুকে নিয়ে যেতে চায় বাথরুমের আয়নার সামনে। পিকু চিৎকার করে ওঠে, 'না আমি যেতে চাই না।'

কিন্তু পিকুর কথা শোনার মতো কেউ নেই। তার বিম্ব তাকে সজোরে ধাক্কা মারে আয়নার দিকে। সে আয়নার ভেতর চলে যায়।

পিকু দেখে সে বাথরুমের ভেতরেই দাঁড়িয়ে। কিন্তু সবকিছু কেমন উলটো। বুঝতে পারে সে আয়নার ভেতর। আয়নার বাইরে সে তাকিয়ে দেখে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। পিকু আয়নায় হাত দেয় কিন্তু বের হওয়ার কোনো রাস্তা পায় না। সে চিৎকার করে, 'বের করো আমায়।' কিন্তু কেউ তার কথা শুনে না।

পিকুর বিম্ব বাথরুমের আয়নাটা খুলে তা ভেঙে ফেলার জন্য উদ্যত হয়। ভেঙে যায় আয়না। পিকু দেখে সবকিছু অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে চারপাশে যেন একটা কাচের টুকরো। সে চিৎকার করে ওঠে।

'পিকু, পিকু, কী হয়েছে তোমার? তাড়াতাড়ি ওঠো। স্কুলবাস চলে আসবে। পিকনিকে যাবে না?' মা ডাকে পিকুকে।

পিকু তাড়াতাড়ি উঠে বসে। সে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল। যাক, সে আয়নায় বন্দি হয়ে যায়নি।

'এই তাড়াতাড়ি ওঠো। বাস এসে পড়বে তো।'

'এই তো মা উঠছি।' বলেই পিকু ফ্রেশ হওয়ার জন্য বাথরুমে যায়। আয়নায় তাকিয়ে দেখে, না সব ঠিকই আছে।

পিকুর আয়নার সামনে থেকে সরে আসে। বাথরুম থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু আয়না থেকে তার বিম্ব সরে না। বলে, 'পিকু আমাদের শীঘ্রই দেখা হবে।'

নবম শ্রেণি, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ।

তাসনীম বিনতে সিদ্দিক, শিশু শ্রেণি, আর কে মিশন স্কুল, ঢাকা

নিবন্ধ

গরমে পানিশূন্যতা থেকে বাঁচার উপায়

মো. জামাল উদ্দিন

আমাদের দৈনন্দিন কাজের রুটিন পরিবর্তন না হলেও ঋতুর পরিবর্তন ঠিকই হয়। আর একেক ঋতুতে প্রকৃতি একেক রূপ ধারণ করে। গ্রীষ্মকালে তীব্র দাবদাহ আর তার সাথে বিভিন্ন সমস্যা। এর মধ্যে প্রধান ও সাধারণ সমস্যা হচ্ছে পানিশূন্যতা বা ডিহাইড্রেশন। শরীরে পানির স্বল্পতাকে ডাক্তারি পরিভাষায় বলে ডিহাইড্রেশন। গবেষণায় দেখা গেছে, গরমে পানিশূন্যতার মূল কারণ ঘেমে যাওয়া। আমরা যতটুকু ঘামি তার তুলনায় সাধারণত কম পানি পান করি। । তখন অতিরিক্ত ঘেমে ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা হয়।

যে-সকল কারণে ডিহাইড্রেশন হয়ে থাকে

১. অপর্যাপ্ত পানি পান করা বা পানি পান করতে না পারা

২. ডায়রিয়া, কলেরা বা অতিরিক্ত বমি হওয়া

৩. যে-কোনো কারণে অতিরিক্ত ঘাম

৪. ওষুধ গ্রহণের কারণে অতিরিক্ত মূত্রত্যাগ ইত্যাদি।

ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ

১. অতিরিক্ত পিপাসা লাগা

২. মুখ গলা শুকিয়ে যাওয়া এবং জিহ্বা ভারী হয়ে ফুলে উঠা

৩. শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করা/অবসাদ ভর করা

৪. মাথা ঘুরানো

৫. অনিয়মিত হৃদস্পন্দন হওয়া বা বুক ধড়ফড় করা

৬. প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া

৭. বিভ্রান্তি বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ মানসিক আচরণ করা

৮. খিঁচুনি কিংবা জ্ঞান হারানো

৯. হঠাৎ চোখের সামনে ঘোলা দেখা বা মূর্ছা যাওয়ার মতো অবস্থা

পানিস্বল্পতা দূর করার ঘরোয়া উপায়

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ডিহাইড্রেশন এর চিকিৎসা বাড়িতেই নেওয়া যায়। বাড়িতে এর ব্যবস্থা নেওয়া খুবই সহজ। এসো জেনে নেই ঘরোয়াভাবে ডিহাইড্রেশন দূর করার উপায়—

❑ যদি শরীরে পানিস্বল্পতা দেখা দেয় তবে নিয়মিত বিরতিতে পানি পান করা উচিত। এতে ডিহাইড্রেশন দূর হবে। প্রতিদিন ৮-১০ গ্লাস পানি পান করলে শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য ঠিক থাকে।

❑ ডাবের পানিতে থাকা সোডিয়াম ও পটাশিয়াম শরীরের মিনারেল ঘাটতিও দ্রুত মেটায় এবং ডিহাইড্রেশন দূর করে ।

❑ প্রচণ্ড গরমে লেবুর পানি শরীরের মিনারেল ঘাটতিও মেটায়। এক গ্লাস পানিতে অর্ধেকটা লেবু চিপে তাতে মধু মিশিয়ে পান করলে ভালো উপকার পাওয়া যায়।

❑ গ্লুকোজ পানিতে গুলিয়ে খেলে পানির চাহিদার পাশাপাশি দ্রুত শক্তি ফেরাতে সাহায্য করে।

❑ ডিহাইড্রেশনের লক্ষণ দেখা দিলেই খাবার স্যালাইন এবং প্রচুর পানি পান করতে হবে

তবে এসব ব্যবস্থা নেওয়ার পরও রোগীর অবস্থা বেগতিক হলে বা অবস্থার কোনো উন্নতি না হলে আর অপেক্ষা না করে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

কিছু নিয়ম মেনে চললে ডিহাইড্রেশন থেকে বেঁচে থাকা যায়। যেমন: বাইরে বের হবার সময় পানির বোতল সবসময় সাথে রাখতে হবে। যত বেশি ঘাম হবে তত বেশি পানি পান করতে হবে। নিয়মিত সরস ফল বা ফলের রস পান করে শরীর ঠান্ডা করার চেষ্টা করতে হবে। শরীরে ঠান্ডা পানির ছিটা দেওয়া যেতে পারে। সম্ভব হলে শরীরে একটু ভেজা তোয়ালে পেঁচিয়ে রাখলে ভালো হয়। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার, সালাদ ও বিভিন্ন পানীয় খাবারের তালিকায় যোগ করা যেতে পারে ।

নিবন্ধ

বিশ্ব রক্তদাতা দিবস

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

অগণিত মুমূর্ষু রোগীকে স্বেচ্ছায় রক্তদান করে যারা জীবন বাঁচাতে সাহায্য করেন তাদের দানের মূল্যায়ন, স্বীকৃতি ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্যে বিশ্বজুড়ে ১৪ই জুন পালন করা হয় বিশ্ব রক্তদাতা দিবস।

২০০৪ সালে প্রথম পালিত হয় বিশ্ব রক্তদাতা দিবস। রক্তের গ্রুপের আবিষ্কারক কার্ল ল্যান্ডাইস্টেনার জন্মেছিলেন ১৪ই জুন ১৮৬৮ সালে। তাঁর স্মরণে ২০০৪ সাল থেকে এ দিবসকে বিশ্ব রক্তদাতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য দেশের জনগণকে প্রাণঘাতী রক্তবাহিত রোগ এইডস, হেপাটাইটিস-বি ও হেপাটাইটিস-সি সহ অন্যান্য রোগ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য স্বেচ্ছায় রক্তদান ও রক্তের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা।

বিশ্বের প্রায় ৬০টি দেশে শতভাগ স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। উন্নত বিশ্বে স্বেচ্ছায় রক্তদানের হার প্রতি ১ হাজারে ৪০ জন আর উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রতি ১ হাজারে ৪ জনেরও কম।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের জনগোষ্ঠীর ২ শতাংশ লোক বছরে একবার রক্তদান করলে আমাদের দেশে রক্তের অভাব থাকবে না। তবে ২০২০ সালে আমাদের দেশে চাহিদার শতভাগ স্বেচ্ছায় রক্তদানের মাধ্যমে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস

মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬শে জুন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে ১৯৮৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় দিনটিকে মাদকবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত হয়। পরের বছর থেকেই বিশ্বব্যাপী দিবসটি পালিত হচ্ছে।

বাংলাদেশে মাদকাসক্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলছে। এই বাস্তবতায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালন করা হয়। কারণ মাদক যে-কোনো দেশের উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। মাদক উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই মাদকের অপব্যবহার ও পাচার প্রতিরোধ করা অত্যন্ত জরুরি।

আন্তর্জাতিক ইয়োগা দিবস

একুশে জুন আন্তর্জাতিক ইয়োগা দিবস। বিশ্বের ১৯০টি দেশের মতো বাংলাদেশও প্রতিবছর ইয়োগা দিবস পালন করে। ২০১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে ভাষণ দেওয়ার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক ইয়োগা বা যোগ দিবস পালনের ঘোষণা করেন।

ইয়োগা বা যোগব্যায়াম শুধু রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণই করে না অনেক রোগ নিরাময়েও ভূমিকা রাখে। প্রাণায়াম যোগাসনের বিভিন্ন মুদ্রা এবং ধ্যান বা মেডিটেশন এই তিনের সমন্বয়েই বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয় ইয়োগা চর্চায় অসংখ্য মানুষ কাটিয়ে উঠছে হতাশা আর মানসিক অবসাদ।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পথশিশুরা

জান্নাতে রোজী

প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছে স্ট্রিট চিলড্রেন ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপ। ৩০শে এপ্রিল থেকে ৮ই মে ২০১৯ লন্ডনে পথশিশুদের জন্য এ ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়। এমন উৎসবে অংশ নেওয়াটাই বড়ো ব্যাপার। সেখানে সিক্স-এ-সাইড টুর্নামেন্টে প্রথম অংশ নিয়েই সেমিফাইনালে উঠে বাংলাদেশের শিশুরা।

গ্রুপ পর্বের প্রথম দিনে মরিশাস ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছিল বাংলাদেশ। দ্বিতীয় দিনে উত্তর ভারত ও নেপালের বিপক্ষে দুটি জয় পেয়ে বাংলাদেশ দল চলে যায় সেমিফাইনালে। বাংলাদেশ দলে খেলেছে সানিয়া মির্জা, জেসমিন আক্তার, স্বপ্না আক্তার, আরজু রহমান, রাসেল ইসলাম রুমেল, আবুল কাশেম, রুবেল ও নিজাম হোসেন।

লন্ডনের স্ট্রিট চাইল্ড ইউনাইটেড বাংলাদেশের পথ-শিশুদের বিশ্বকাপে খেলার আমন্ত্রণ জানায়। আইসিসি ক্রিকেট ওয়ার্ল্ড কাপের পাশাপাশি পথশিশুদের নিয়ে এ আয়োজনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি অবজ্ঞা-অবহেলা দূর করা এবং সচেতনতা তৈরির চেষ্টাতেই এই আয়োজন। এতে বাংলাদেশ, ইংল্যান্ডসহ ১০টি দেশের ৮০ জন পথশিশু (যারা এক সময় পথে ছিল) অংশগ্রহণ করে। মজার ব্যাপার হলো সব দেশ থেকে চারজন মেয়ে এবং চারজন ছেলে শিশুকে নির্বাচিত করা হয়েছে।

বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ নারী আন্তর্জাতিক গোল্ডকাপ

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত হয় বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ আন্তর্জাতিক গোল্ডকাপ। ২২শে এপ্রিল থেকে ৩রা মে ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মঙ্গোলিয়া, লাওস, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তানসহ ৬টি দেশ দুটি গ্রুপে অংশগ্রহণ করে। দুটি গ্রুপ থেকে পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থেকে বাংলাদেশ ও লাওস ফাইনালে উঠে। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় ফণীর কারণে ফাইনাল ম্যাচ বাতিল করে বাংলাদেশ ও লাওসকে যৌথ চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের সানজিদা আক্তার সেরা খেলোয়াড় ও মাহমুদা আক্তার সেরা গোলরক্ষক নির্বাচিত হয়।

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

এ মাসের শব্দধাঁধা

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি:১. ক্ষতিসাধন, ৩. নয়নাভিরাম, ৪.মতভেদ, ৬. অসৎ, ৮. প্রতিজ্ঞা, ১০. আস্কারা

উপর-নিচ: ১. অসংখ্য, ২. ভোলা জেলার একটি উপজেলা, ৩. প্রতিশোধ, ৫.বিশ, ৭. বিবাহ, ৯. পোকা

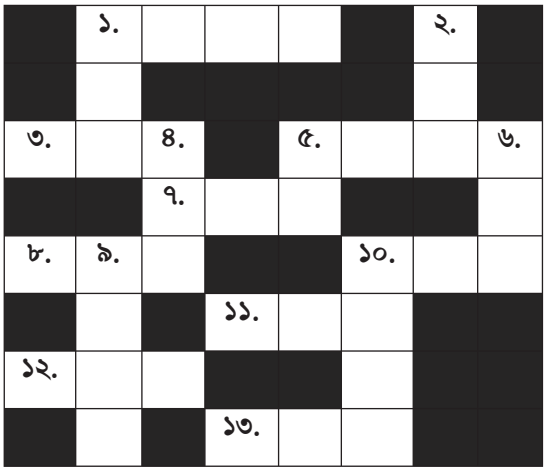

এ মাসের ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

২	*		-	৬	=	
+		-		+		-
	/	২	+		=	৭
/		/		-		+
৩	-		-	২	=	
=		=		=		=
	+	৫	−		=	১

গত সংখ্যার শব্দধাঁধার সমাধান:

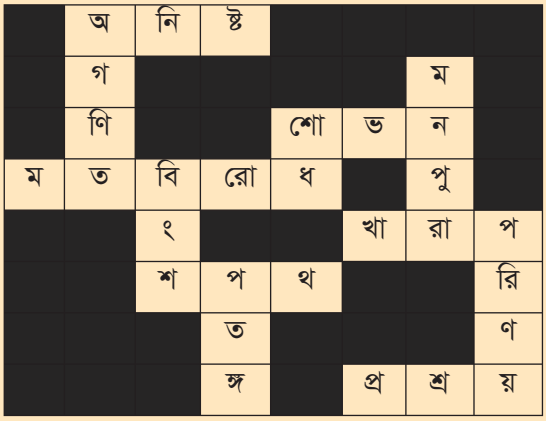

গত সংখ্যার ব্রেইন ইকুয়েশনের সমাধান:

৯	/	৩	+	১	=	৪
-		*		+		+
৪	*	২	-	৫	=	৩
/		-		-		+
২	+	১	-	২	=	১
=		=		=		=
৭	+	৫	-	৪	=	৮

ছক মিলাও

ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: নগরপিতা, অষ্টব্যঞ্জণ, অলস, চেয়ার, অষ্টম, আহার, হাসি, মনোরম, কলরব, বট

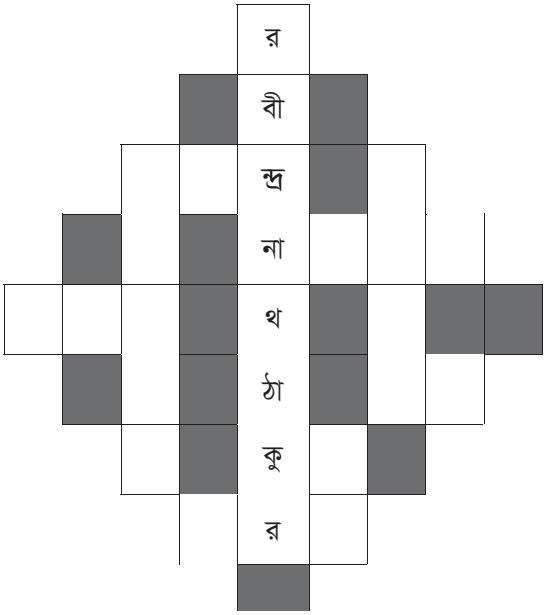

গত সংখ্যার সমাধান:

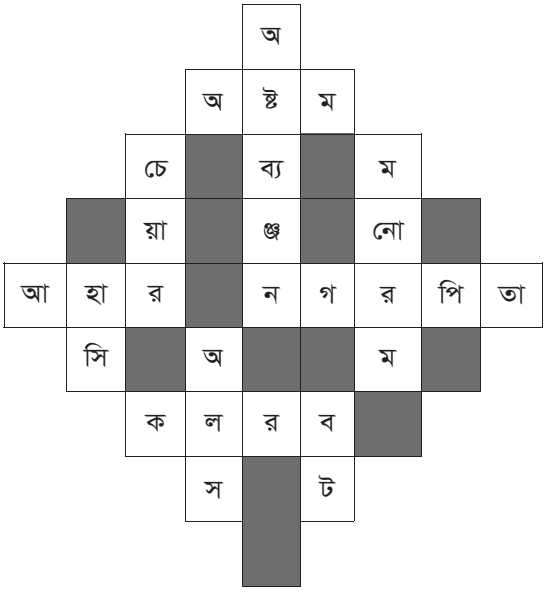

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

১		৫		১৯		২৩		
	৩				২১	২৮		২৬
৯			১৬	১৫	৩০		৩৪	
				১৪		৩২		
৬৫				৬৯	৫০			৩৭
	৭৭							৪০
		৮১				৪৭	৪৬	
	৭৫			৭২		৫৪		
৬১			৫৮		৫৬			৪৩

গত সংখ্যার সমাধান

৭৭	৭৬	৭৫	৪২	৪১	৩২	৩১	৩০	২৯
৭৮	৮১	৭৪	৪৩	৪০	৩৩	৩৪	২৭	২৮
৭৯	৮০	৭৩	৪৪	৩৯	৩৮	৩৫	২৬	২৫
৭০	৭১	৭২	৪৫	৪৬	৩৭	৩৬	২৩	২৪
৬৯	৬৬	৬৫	৬৪	৪৭	১৬	১৭	২২	২১
৬৮	৬৭	৬২	৬৩	৪৮	১৫	১৮	১৯	২০
৫৭	৫৮	৬১	৫০	৪৯	১৪	১	২	৩
৫৬	৫৯	৬০	৫১	১২	১৩	৮	৭	৪
৫৫	৫৪	৫৩	৫২	১১	১০	৯	৬	৫

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়:

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd